দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

মোদীর 'মন কী বাতে' উদ্বুদ্ধ নানা মহল — পৃঃ ২৩

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির উদাসীনতার কারণটা রাজনৈতিক — পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ১৫ মে, ২০২৩।। ৩১ বৈশাখ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৫ মে - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

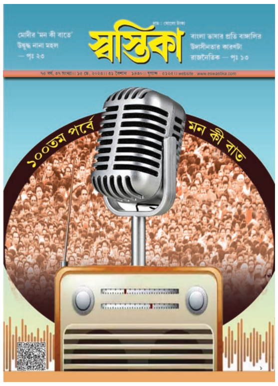

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দ্য আন্ডারকভার ইকনমিস্ট : আমি ও জমি
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

জয় মুসলমানের জয়, দুখেল গাই খুশ হুয়া ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কুকি ও মেতেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মণিপুরে রক্তক্ষয়
◻ প্রদীপ ফাঞ্জৌবাম ◻ ৮

কূটনৈতিকভাবে ভারতের দ্বারস্থ বাংলাদেশ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

কালিয়াগঞ্জের ঘটনার জন্য পুলিশ নিজেই দায়ী
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির উদাসীনতার কারণটা রাজনৈতিক
◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৩

সার্বিক সড়ক উন্নয়নে ভারত সরকারের অবদান
◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৭

উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পথে অন্তরায়
◻ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ◻ ১৮

মোদীর মন কী বাতে উদ্বুদ্ধ নানা মহল ◻ সুমন চন্দ্র দাস ◻ ২৩

দেশের কোণায় কোণায় সব সময়ই লাইভ 'মন কী বাত'
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৪

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' আজ সকলের মনের কথা
◻ বিমল শঙ্কর নন্দ ◻ ২৬

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও তার উদ্যান
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড একটা নির্ভেজাল মিথ্যা
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৫

চব্বিশের নির্বাচনে রামধনু জোটের সম্ভাবনা
◻ তারক সাহা ◻ ৩৯

সত্যজিতের শ্যামাসংগীতে রামপ্রসাদী ছোঁয়া
◻ ড. জয়ন্ত কুশারী ◻ ৪৩

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বুদ্ধি ◻ কমলেশ সরকার ◻ ৪৫

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২২ মে ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২২ মে ২০২৩

বাঙ্গলার জামাইষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ দাবদাহে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, ঠিক তখনই একটি দিন হইহই করে এসে পড়ে এবং এসেই মরূদ্যান রচনা করে দেয়। বলা বাহুল্য, সেটি জামাইষষ্ঠীর দিন। এই দিনের বিশেষ উৎসবে কী হয় তা সকলেই জানেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আমরা এই উৎসবের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরব।

লিখবেন— ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা বসাক ভড়, আশিস কুমার বৈদ্য প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইথার তরঙ্গে মনের কথা

মনের কথা তাঁহারাই বলিতে পারেন যাঁহারা আপন মনের সংবাদ রাখেন। যাঁহারা জানেন পার্থিব পাওনাগণ্ডার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনটিকে মারিয়া ফেলেন নাই। আবার মনের কথা বলিয়া ফেলিলেই হইল না, তাহা শুনিবার লোকও থাকা চাই। সম্প্রতি এমনই অত্যাশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটিয়াছে ভারতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী তাঁহার বেতার অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'-এ মনের কথা বলিতেছেন আর কোটি কোটি ভারতবাসী তাহা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিতেছে। একটি মনের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে কোটি কোটি মন।

'মন কী বাত' শুরু হইয়াছিল ২০১৪ সালে। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হইবার অব্যবহিত পরেই। তাহার পর আট বৎসর কাটিয়াছে। 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি শততম পর্বে উপনীত হইয়াছে। এবং এই উপলক্ষ্যে দেশে ও দেশের বাহিরে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহা এককথায় অভূতপূর্ব। কোনো বেতার অনুষ্ঠান এই পর্যায়ের জনপ্রিয় হইবে তাহা বোধহয় বেতার কর্তৃপক্ষও কল্পনা করিতে পারেন নাই। এখন প্রশ্ন হইল, অনুষ্ঠানটির এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপম বাচনশৈলীর কথা। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ন্যায় তিনি তাঁহার বক্তব্যকে তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করেন না। তথ্য ও সত্যকে একসূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার অননুকরণীয় বাচনশৈলীর মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করেন। সত্যের সৌরভ থাকায় তাঁহার বক্তব্য অচিরাৎ শ্রেতার মর্মে প্রবেশ করে। এবং বিশ্বসের সিন্দুকে সযত্নে রক্ষিত হয়। 'মন কী বাত'-এর ক্ষেত্রেও তাহার কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। দুই পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। বলা যাইতে পারে, সমগ্র ভারতবর্ষকে ভালোবাসার বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে 'মন কী বাত'।

'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই দেশের সফল উদ্যোগী নাগরিকদের উদাহরণ দিয়া থাকেন। কখনো কখনো তাঁহাদের সহিত দূরভাষ মাধ্যমে কথাও বলেন। যাঁহাদের নাম অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হয় কিংবা যাঁহাদের সহিত প্রধানমন্ত্রী বার্তালাপ করেন, তাঁহারা যে সুখ ও আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছাইয়া যান তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য দেশেরই কোনো যুবক বা যুবতীর দৃষ্টান্তকে তুলিয়া ধরিতেছেন, ইহা কম কথা নহে। ইহাতে যে শুধু যুবসমাজ উদ্‌বুদ্ধ হয় তাহাই নহে, যাহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া ধরা হইতেছে তিনি তাঁহার দেশের প্রতি, তাঁহার জন্মভূমির প্রতি এক চিরকালীন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হন। তিনি অনুভব করেন তাঁহার প্রধানমন্ত্রী আকাশের নক্ষত্র নহেন। ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়। এমনকী চাহিলে তিনি নিজেই দেশের কোনো কৃতী সন্তানের সহিত কথা বলিতে পারেন, তাঁহাকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করিতে পারেন। নিঃসন্দেহ ইহা 'মন কী বাত'-এর একটি অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করিলেই নহে। 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান যখন শুরু হইয়াছিল তখন অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন বেতারের টক-শোতে অংশগ্রহণ করিবেন? ইহা লইয়া যথারীতি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমগুলিতে বিতর্কের তুফান তুলিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। আসলে সেইদিন যাহারা 'মন কী বাত' লইয়া রাজনীতি করিয়াছিলেন তাহারা কংগ্রেসি-বাম ঘরানার নেতা। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, তাহারা লুটিয়েন অভিজাততন্ত্রের প্রতিনিধি। যাহারা আজিও বিশ্বাস করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইবেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের দোসর। তিনি সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ হইতে শতহস্ত দূরে থাকিবেন। 'মন কী বাত' সেই অভিজাততন্ত্রকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে ইহাও ভারতবর্ষের এক মহৎ প্রাপ্তি।

সুভাষিতম্

সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্মসু পরাঙ্মুখঃ।

পীয়ূষকলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি।।

ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও যে সৎকর্ম থেকে দূরে থাকে, সে অমৃতকলস ভেঙে ফেলে বিষভাণ্ড গ্রহণ করার ইচ্ছাই করে থাকে।

দ্য আন্ডারকভার ইকনমিস্ট

আমি ও জমি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বইয়ের পাতা নয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মলাটের নীচেও অবস্থান করেন। রবি ঠাকুর নাম রেখেছিলেন অপার্থিব, অমর, অবিনশ্বরের প্রতীক হবেন বলে। ঘটেছে উলটো। লেখিকা সিলিভিয়া নাসের 'গ্র্যান্ড পারসিউট--- দ্য স্টোরি অব ইকনমিক জিনিয়াস'— গ্রন্থে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন 'অর্থনীতির অধ্যাপক নয়, অমর্ত্য সেন পুলিশ পাহারায় এশিয়া আর শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর মতো ঘুরে বেড়ান।' আপাতত 'আমি আর জমি'-তে আটকেছেন অপার্থিব সেন। বিশ্বভারতী তাঁকে জমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে। উচ্চ আদালত তা স্থগিত করে নিম্ন আদালতের ফয়সালা নিতে বলেছে। 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'। সেনের মতো খ্যাতিমান মানুষের কিছু অযাচিত সমর্থক জুটে গিয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অপ্রকৃতিস্থ এক গানওয়ালাও রয়েছেন। তিনি একসময় রাজনীতি করতেন। অমর্ত্যবাবু যেমন অর্থনীতির সঙ্গে দর্শন আর রাজনীতিকে মিশিয়ে দেন। আমার জানা নেই ইদানীংকালে অর্থনীতিতে নোবেল স্মারক জয়ী আর কেউ এই ধরনের উন্মাদনার আস্বাদ পেয়েছেন কি না।

অমর্ত্যবাবু এখন বিদেশে রয়েছেন। কেউ বলছেন, 'যার জমি তার হুঁশ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই'। জমি ঘিরে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে সমস্ত নাটুকেপনার আনন্দ তিনি উপভোগ করছেন। অন্যকে বেহুঁশ করে দেওয়ার হুঁশ তাঁর আছে। তাই ধামা বাজিয়েদের নিরস্ত করছেন না। একটি ছোট জমির কর্তৃত্ব ঘিরে এই নিরন্তর আলোচনা অর্থহীন প্রধানভাবে যখন দুর্নীতি আর ঘোর অন্যায় জাঁকিয়ে বসেছে। সেনের সমর্থকরা যতটা না জমি নিয়ে আগ্রহী তার চাইতেও বেশি বাঙ্গালি হিসেবে সেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে চিন্তিত। সেনের আগে ও পরে বেশ কয়েকজন ভারতীয় আর বাঙ্গালি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাই সেনকে ঘিরে বাঙ্গালির এই অহেতুক আদেখলাপনা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বভারতীকে সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দর্শনকে আক্রমণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। সেনেরও তাই লক্ষ্য।

তাই তিনি চুপ করে নিজেকে রাজনীতিতে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন। 'দ্য সানডে টাইমস' বেস্ট সেলারের লেখক টিম হারফোর্ড তাঁর বই 'দ্য আন্ডারকভার ইকনমিস্ট'-এ দেখিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা কী অদ্ভুত কায়দায় মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে মুনাফা লোটে। সেন একটু অন্যরকমের 'আন্ডারকভার অপারেশন' চালাচ্ছেন।

তৃণমূল যে কেবল 'তোলামূল' আর 'লুম্পেনেদের দল' নয় সেটা বোঝাতেই মমতা 'সেন তকমা' ব্যবহার করছেন, যদিও তিনি ভালোই জানেন সেনের জমির গলদ কোথায় বাসা বেঁধেছে।

সমান্তরালে আইনি লড়াই জারি রেখেছেন। যাঁরা সেনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন সবাইকে তিনি চেনেন, জানেন বা পছন্দ করেন এমন নয়। অনেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অথচ এটা সেন বলছেন না যে আইন আইনের পথে চলবে। আপনারা কিছু করবেন না। বিশ্বভারতীর সঙ্গে জমির লড়াইটা সেন ইচ্ছা করেই রাজনৈতিক করে দিয়েছেন। তাই আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছেন লড়াই লম্বা হবে। তাঁর আর বিশ্বভারতীর মাঝখানে সৃষ্টি হবে বহু মুখ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জায়গা দিয়ে সেন সেই রাজনীতিটা নিজেই ডেকে নিয়ে এসেছেন যাতে উপায়ের সঙ্গে পরাক্রম জুড়ে যায়। সেন-কে 'জমি দখলকারী' বলে দাবি করেছে বিশ্বভারতী। দাবিটা গ্রাহ্য কিনা আদালত স্থির করবে। মমতা কিন্তু গায়ের জোরে জানিয়েছেন জমিটা সেনের। দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ হয় না। মমতা আইন বা নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। এই অসুখটা অনেকের আছে। পনেরো বছর আগে মমতাকে অবিবেচক আর বোধবুদ্ধিহীন বলেছিলেন সেন। মমতা জানেন এক শ্রেণীর বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর কাছে সেনের আদর কদর রয়েছে। রাজ্যের দুর্নীতি বিরোধী মিছিলে তাঁদের দেখা যায় না। সেনের জমি পাহারায় তাঁদের পাওয়া যায়। তৃণমূল যে কেবল 'তোলামূল' আর 'লুম্পেনেদের দল' নয় সেটা বোঝাতেই মমতা 'সেন তকমা' ব্যবহার করছেন যদিও তিনি ভালোই জানেন সেনের জমির গলদ কোথায় বাসা বেঁধেছে। বীরভূমে তৃণমূল বাঁচাতেই মমতা সেনের গড় আগলাতে রাস্তায় নেমেছেন। তবে মনে হয় না তাঁর যাত্রা সফল হবে। মমতা বা সেনের জন্য কোনো আলাদা আইন নেই। □

জয় মুসলমানের জয়, দুধেল গাই খুশ হুয়া

সংখ্যালঘুপ্রেমীষু দিদি,

আজ জানেন এক অবাক কাণ্ড। সবাই পরে জানতে পারবেন। কিন্তু আমি চিঠিটা লিখছি পঁচিশে বৈশাখে। এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই চিঠি। আজ মঙ্গলবার। আর ঠিক একদিন আগে মানে সোমবার সন্ধ্যায় আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমা রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর আজ তার পরে আপনি নিজেকে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত বলে দাবি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সহিষ্ণুতাকে ধারণ করেছিলেন, তিনি তো শিল্পের স্বাধীনতা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তাঁর বাংলা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে? না, এসব মোটেও আমি বলছি না। আমি আসলে খারাপ লোকেদের কথা উচ্চারণ করছি। আমি তো বরং, মনে করি সংখ্যালঘু মানে দুধেল গাইদের জন্য সব করা যায়। প্রয়োজনে, ধর্ম বদলেও নেওয়া যায়। তাই আপনি যদি সেটা করেন আমি একটুও অবাক হব না। বরং, পাশে থাকব। কিন্তু আপনি করবেন না তা আমি জানি। আসলে আপনার তো গাছেরটাও চাই, তলারটাও চাই।

আজ এই দিনে সবাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। কিন্তু বাংলার বৈশাখে খররৌদ্র দিনের গ্লানি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেমন যেন আইসক্রিমের মতো গলে যায়। আমি আপনার কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক হলেও মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রনাথও পড়ি। বেশি পড়ি না, কারণ শাসকের দুর্বিনীত কাজকর্মে চিরকালের রবীন্দ্রনাথ কেমন যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যান আমার কাছে। বেশি পড়লে পাছে আপনার বিরোধী হয়ে যাই তাই আজকাল রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলি। বরং, আপনিই ভালো।

রবীন্দ্রনাথের শব্দ থেকে শব্দে উদারতার স্বাক্ষর, অন্তরে যে সহিষ্ণুতাকে তিনি ধারণ করেছিলেন তা আজ খান খান হয়ে যাচ্ছে । আজ আমাদের ঘরে শুধুই লক্ষ্মণরেখা, মনের প্রাচীর আজ সত্যিই সমাজকে ক্ষুদ্র করে রাখতে চায়। আজ আমাদের চিত্তে ভয়। জ্ঞান শাসকের নির্দেশপ্রাপ্ত। সব সময়ে নত শিরে থেকে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়ার সময় বা যৌক্তিকতা কোথায়? আজ সংকট এখানেই যে শাসক মেধার ম্যানুয়্যাল রচনা করে দিচ্ছে। এই রে আবার, আপনার সমালোচনা হয়ে যাচ্ছে। যেটা আপনি মোটেও পছন্দ করেন না। তাই করছি না। আমাকে আবার যদি আপনি মাওবাদী বা বিজেপি বলে দেন, সেটাই ভয় পাই। দিদি, বিশ্বাস করুন আমি আপনার একান্ত অনুগত ভাই।

তবে দিদি একটা কথা বলতেই হবে, আজ আমাদের পথের মোড়ে হিংসা দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের মর্মে মর্মে দ্বেষ গেঁথে দেওয়া হয়। আজ তো ঝড়ে ঘর

> **'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করে বেশ করেছেন। মুসলমান ভোটের জন্য দরকারে আইএসআইকে সমর্থন করাও যেতে পারে। ওই ৪০ শতাংশের মধ্যেই যে আপনার প্রাণ ভোমরা।**

ভেঙে পড়ার দিন। আজ রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকালেই মনে হয় ঝড়ের রাতে অভিসারের কথা। আর মনে হয় দুর্নীতির যে বিষ গোটা রাজ্যে তাতে রবীন্দ্রনাথ থাকলে বিরোধী মিছিলে অংশ নিতেন। আসলে দিদি, আজ দুর্নীতির পাঁকে সমাজ যে ভাবে নিমজ্জিত সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ছে কবির সেই কবিতাটি। সেই যে 'ন্যায়দণ্ড' কবিতার শেষ দুটি লাইনে কবিগুরু লিখেছিলেন—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

আজ যাঁরা অন্যায় দেখে বলছেন, আমি জানতাম না, আমরা জানতাম না তাঁরাও সমান অন্যায় করেছেন তা তো রবীন্দ্রনাথই বলে গিয়েছেন। বারবার তাঁর কণ্ঠ হিংসা, সন্ত্রাস, রক্তপাতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সব যেন কেমন মনে হয় আজকের বাংলাকে তিনি কত বছর আগেই দেখে গিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর কবিতা, তাঁর লেখাই পাথেয় হোক আমাদের। কিন্তু দিদি, আপনি সেই দলে নন আমি জানি। রাজ্যে চাকরি বিক্রি হচ্ছিল, গোরু, কয়লা, বালি পাচার হচ্ছিল কিন্তু আপনি কিছুই জানতেন না বলেই আমি বিশ্বাস করি। যেমন এটাও আমি মনে করি দল চালানোর জন্য সবাই কাড়ি কাড়ি টাকা দিলেও সেই টাকার উৎস সম্পর্কে আপনি কৌতূহল প্রকাশ করেননি। ভাগ নিয়েছেন বলে আপনাকে যাঁরা দোষের ভাগীদার বলে আমি তাঁদের দলে নই।

শুরুর কথাটা আবার শেষে বলি। 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করে বেশ করেছেন। মুসলমান ভোটের জন্য দরকারে আইএসআইকে সমর্থন করাও যেতে পারে। ওই ৪০ শতাংশের মধ্যেই যে আপনার প্রাণ ভোমরা। □

অতিথি কলম

প্রদীপ ফাঞ্জৌবাম

কুকি ও মেতেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মণিপুরে রক্তক্ষয়

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে প্রান্তিক হয়ে পড়ার আশঙ্কাতেই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পথ নিয়েছে মণিপুর।

মে মাসের ৩ তারিখে চকিতে মণিপুরে বিভিন্ন শহরে যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল তার আন্দাজ কারোরই ছিল না। কিন্তু এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে যা এই দীর্ঘকালীন ধূমায়িত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ তা কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত ছিল। ৩ তারিখে কেবলমাত্র দেশলাইয়ের কাঠিটি মারা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে হিংসা কেবলমাত্র কুকি আর মেতেইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন, নাগা বা অন্য উপজাতিদের ভূমিকা থাকবে না? প্রাথমিক যে কারণটা প্রকাশ্যে আসছে তা হলো উপজাতি সংহতি সংক্রান্ত যে র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল নাগা ও কুকি উভয় সম্প্রদায়ই সমস্ত জেলাগুলিতে তার দাবি ছিল মেতেইদের উপজাতি সম্প্রদায় হিসেবে যেন না অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চুরাচন্দ্পুরে যেহেতু কুকিদের বসবাস বেশি তাই প্রথমে হানাহানিটা সেখানেই শুরু হয়। এখানে দুটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সর্বদা কাজ করে। প্রথমটি হলো কুকিরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এই প্রচারের মধ্যে অর্ধসত্য আছে। কিন্তু এই উত্তেজক ইতিহাসটি ধরেই প্রায়শই বিরোধী গোষ্ঠী তাদের উদ্বাস্তু বলে উসকানি দেয়।

স্বাভাবিকভাবে কুকিদের মধ্যে হিংস্র প্রতিবাদের ইচ্ছে বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে কুকিদের মিছিল যখন শেষ হয়ে আসছিল তখনই হঠাৎ খবর রটে কুকি বিরোধী মেইতিরা তাদের বিষ্ণুপুর জেলার সীমান্তে অবস্থিত কুকিদের সংগ্রামে নিহত মানুষদের একটি স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বহু বিক্ষুব্ধ কুকি বীরবিক্রমে তরবঙ্গ গ্রামে মেইতিদের ঘরবাড়িতে ব্যাপক আগুন লাগিয়ে দেয়। আদতে স্মৃতিস্তম্ভ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কোনো ক্ষতি হয়নি। আশপাশে দু চারটে টায়ার পোড়া টুকরো দেখা যায়। এটাকেই চূড়ান্ত হিংস্র আক্রমণ বলে রটানো হলো।

ওদিকে কুকিদের ঘর বাড়িতে আগুন দেওয়ার ছবি ব্যাপকভাবে মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে লাগল। এর ফলে অনেকে মনে করল সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই হিংসা আরও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজধানী ইম্ফলে সন্ধ্যে ৭টার পর পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু কিছু পরে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও গৃহদাহের খবর আবার উঠে আসতে থাকে ল্যাসবুলেন থেকে। একই সময়ে দু'টি মেতেই কলোনি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার খবর আসে কুকি অধ্যুষিত মোরে শহর থেকে। এখনও সরকারের তরফে বড়োসড়ো কোনো সামাল দেওয়ার খবর আসেনি। বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসার ঘটনা ভালোরকম ছড়িয়ে পড়ার পরের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রের হাতেই রাজ্যের আইন ব্যবস্থা ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ সরাসরি অধিকৃত হয়।

যদিও ইম্ফল বা অনান্য হিংসা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি থেকে হতাহতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু সংবাদপত্র অনুযায়ী Regional Institute of Medical Science-এ ১২টি মৃতদেহ Post Mortem -এ পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, ইম্ফল শহরে মেইতিদের অধিক সংখ্যার উপস্থিতি থাকায় বহু সম্পত্তি, কুকিদের চার্চ ও গাড়ি জ্বালানো হয়। এটা ঘটনা যে কুকিদের মধ্যে দীর্ঘকালীন ধরে চলে আসা এক প্রথার ফলে চাষের জমিতে বেশি লোককে চাষ করার অধিকার দেওয়া হয় না। কুকি গ্রামগুলির মালিকানা থাকে সেখানকার বংশানুক্রমিক অধিকারীর হাতে, গ্রামবাসীদের হাতে নয়। এর ফলে প্রধানের পুরুষরা গ্রাম ছেড়ে

অন্য জায়গায় বাস বসিয়ে প্রধান হওয়ার বাসনায় গ্রাম ছাড়ে। বহু গ্রামীণ মানুষও এদের সঙ্গী হয়। এর ফলে প্রায়শই তাদের প্রতিবেশী পাহাড়ি নাগাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কেননা নাগাদের জমিতে হাত পড়ে। ইদানীং পরিস্থিতি সামলে রাখতে মিডিয়া প্রচার ছাড়াও সরকারের তরফে কুকিদের একটু খাটো চোখে দেখা হয়। এই বাতাবরণে সরকারের তরফে যখন সাধারণ নিয়মে অধিগৃহীত বনাঞ্চল থেকে এদের সরে যেতে বলা হয় বা গাঁজার চাষে বাধা দেওয়া হয়, তখনও কুকিরা ভাবে বোধ হয় শুধু তাদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। তারা খুবই দুঃখিত বোধ করে।

এদিকে ১০ মার্চ রাজ্য মন্ত্রিসভা হঠাৎ দুটি কুকি জঙ্গিদলকে KNA ও DRA মোট ২৪টি দলের আদি জোট থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

কিন্তু এই সংঘর্ষের অপর অংশীদার মেইতিরাও কিন্তু একটু পিছিয়ে পড়া অবস্থাতেই রয়েছে। সেই ব্রিটিশ যুগ থেকেই তাদের অবস্থাকে কেউই হিংসে করত না। ১৮৯১ সালে ইংরেজের হাতে তাদের পরাজয়ের পর ইংরেজ তাদের রাজবংশের ধারাকেই তুলে দেয়। চূড়াচান্দকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য একটি রাজবংশের ঝকঝকে এক তরুণকে যে তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল তাকেই অধীশ্বর করা হয়। খাতির করে তারা মেয়েদের কলেজে পড়তে পাঠায়।

১৯০৭ সালে ফেরার পর তার নিয়মমাফিক অভিষেক করান হয়। কিন্তু এর সঙ্গে অসমে পরীক্ষিত জমি সংক্রান্ত যাকে বলে land revenue administration-এর ছকও নিয়ে আসে। এই নিয়ম অনুযায়ী সমতলে চাষযোগ্য জমিগুলির সঙ্গে পাহাড়ে অবস্থিত অসমতল জমিগুলির নির্দিষ্ট পার্থক্য করা হয়। এই নতুন সরকারি নিয়ম প্রয়োগ করার ফলে ইম্ফলের কেন্দ্রীয় অবস্থানে বসবাসকারি প্রধানত মেইতিরা তাদের ঘিরে থাকা পাহাড়ের পরিস্থিতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। এখানে আরও বিচিত্র একটি নির্দেশ জারি হয়। সমতল অঞ্চলগুলি মূলত ইম্ফলকেন্দ্রিক অঞ্চল প্রশাসনিকভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন 'মহারাজা'। অন্যদিকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলি পরিচালনার দায়িত্ব পান President of Manipur State darbar (PMSD)। তখন ইনি হতেন একজন ইংরেজ অফিসার।

শোকসংবাদ

কলকাতা উত্তর-পূর্ব ভাগের আম্বেদকর নগরের স্বয়ংসেবক এবং নগর টোলির সদস্য শ্যামল রায়ের মাতৃদেবী গত ৭ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

একইভাবে আসামে সমতলের বাইরে পাহাড়ি অঞ্চলের ভার ছিল একজন গভর্নরের ওপর আইনসভার ওপর নয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে PMSD মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে নির্দিষ্ট অধিগৃহীত বনাঞ্চল তৈরি করেছেন। এই অঞ্চলগুলিতে কোন মনুষ্য বসতি ছিল না। ১৯৪৯ সালে মণিপুর ভারতের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার পর তৎকালীন Union teritory Government ও এই বনাঞ্চল রক্ষার ব্যবস্থা জারি রাখে। বর্তমান জঙ্গলে অনুপ্রবেশের যে তত্ত্ব চলছে তার মূলে আছে এই ইতিহাস। কিন্তু আর একটি নতুন ফ্রন্ট খুলে গেছে যেটি হল উপজাতি-অউপজাতি সংঘর্ষ।

বর্তমান অবস্থায় মেইতিরা রাজ্যের সমতল জমির মাত্র ১০ শতাংশ অংশে তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চল যা রাজ্যের ৯০ শতাংশ সেখানে তাদের কোন যাতায়াত বা সে অর্থে অধিকার নেই। জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ সেখানে বসবাস করে। মেইতিদের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে ওঠা অসন্তোষ এই অবরুদ্ধ হয়ে থাকার মানসিক হতাশা থেকেই বাড়তে থাকে। 'কুকি' সম্প্রদায়কে যেমন উদ্বাস্তু বলে বিদ্রূপ করা হয় তেমনি কুকি বৌদ্ধিক পণ্ডিতরা 'মেইতিদের' নিজেদের লেখাজোখায় ঠাট্টা করে যে তাদের গর্বের প্রাচীন রাজত্বের ভূমিসীমা মাত্র ৭০০ স্কোয়ার কিলোমিটার।

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে মেইতিরা নিজেদের যথেষ্ট অসহায় ও আবদ্ধ কুয়োর ব্যাং বলে মনে করছে। এই হতাশাই বিক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। সেই জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত উপজাতি ধারায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে যাতে নিজেদেরই জন্মভূমিতে তারা একঘরে হয়ে না পড়ে। অন্যদের ভোগ করা অধিকার যেন তারাও পায়।

(লেখক ইম্ফল রিভিউয়ের সম্পাদক)

বিশেষ সূচনা

আগামী ২৯ মে-র স্বস্তিকা হিন্দু হৃদয়সম্রাট 'শিবাজী মহারাজ বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটিতে শিবাজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির মূল্য একই থাকছে (১৬.০০ টাকা)।

অতিরিক্ত কপির জন্য আগাম জানান, যাতে আপনার চাহিদা মতো স্বস্তিকা পাঠানো সম্ভব হয়।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

কূটনৈতিকভাবে ভারতের দ্বারস্থ বাংলাদেশ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বাংলাদেশের র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ন)-এর ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুলতে এবার সরাসরি ভারতের দ্বারস্থ হলো বাংলাদেশ। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে আমেরিকায় বসবাসরত ভারতীয়দের কাছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁরা যেন আমেরিকার সরকারকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত, সাংগঠনিকভাবে র‍্যাবের সঙ্গে তাঁদের বর্তমান ও প্রাক্তন সাত কর্তার বিরুদ্ধেও মার্কিন-নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের যুক্তি ছিল যে, আমেরিকায় প্রায় ৪৫ লক্ষ অনাবাসী ভারতীয় বসবাস করেন। তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালীও। সুতরাং তাঁদের অনুরোধে র‍্যাবের ও তার সাত কর্তার ওপর থেকে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা জোরালো হবে।

গত ২৩ এপ্রিল ঢাকাতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহি ব্যতীত বরফ গলার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ এগুলো না করতে পারলে র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী পালটা জানিয়েছিলেন, নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় দোষীর ফাঁসির সাজা পর্যন্ত হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় একশোরও বেশি র‍্যাবের আধিকারিক ও কর্মী ছাঁটাইও হয়েছে। তবে ঢাকার এই ব্যাখ্যায় মার্কিন প্রশাসন যে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়নি, তা তাঁদের হাবেভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। এরপরেই ব্যাপারটি নিয়ে নয়াদিল্লির কাছে কূটনৈতিক দৌত্যের অনুরোধ জানায় ঢাকা। গত ২৫ এপ্রিল সাংবাদিক বৈঠক করে এখবর জানান মোনেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১০ ডিসেম্বর র‍্যাব এবং র‍্যাবের বর্তমান ও প্রাক্তন সাত কর্মকর্তার ওপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর বাংলাদেশ ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলারকে ডেকে তাদের আপত্তি প্রকাশ করেছিল। ঢাকার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করে নিষেধাজ্ঞা আরোপকে সঠিক মনে করেনি বাংলাদেশ। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী মোমেন আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে গত ১৬ ডিসেম্বর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় বাংলাদেশের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে ব্লিঙ্কেনকে যে চিঠি দেন মোমেন, সেখানেও র‍্যাবের প্রশংসা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি কেন ভালো, তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রাথমিক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার পর বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই নমনীয় হয়ে আসে। সেদেশের বিদেশসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছিলেন, 'ভিত্তিহীন ও বানানো তথ্যের' ভিত্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

'ভিত্তিহীন ও বানানো তথ্য' কে বা কারা পরিবেশন করলো আমেরিকাকে? ঢাকার তির সে দেশেরই সরকার-বিরোধীদের অর্থাৎ খালেদা জিয়ার বিএনপির দিকে। কূটনীতিবিদরা মনে করছেন, ঠিক এই জায়গাতেই নয়াদিল্লি ঢাকার পাশে এসে দাঁড়াতে চাইছে। প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত কোনোরকম ভাবে নাক গলাবে না, নয়াদিল্লির এই ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও চীন ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিপদ আঁচ করেই বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াতে চাইছে। র‍্যাবের বিষয়ে ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনাকে বাংলাদেশের একাংশ সে সেদেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে ভারত বলে দাগিয়ে দিতে চাইলেও বা সেদেশের সরকার-বিরোধীরা একে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে দেখতে চাইলেও ভারত মনে করছে চীন-পাকিস্তানকে রুখতে ঢাকার পাশে এই মুহূর্তে থাকাটাই সব চেয়ে জরুরি। সাম্প্রদায়িক দল বিএনপির পশ্চাতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন তলানিতে এসে ঠেকলেও চীন-পাকিস্তানের আর্থিক ও অন্যান্য সমর্থনে বিএনপি শুধু যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তা নয়, ক্ষমতার মসনদে বসার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখছে।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেছেন, বন্ধুদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সেদেশের হিন্দুদের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের কথা। পাশাপাশি একথাও ঠিক যে, বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে হিন্দুদের অবস্থা আর শোচনীয় ছিল। এই প্রসঙ্গেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন, ভারত যেমন বিপদের দিনে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার প্রতিদানে তেমনি ঢাকারও উচিত সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। দক্ষিণ এশিয়া থেকে ধর্মীয় কট্টরবাদ নির্মূল করতে ভারত বদ্ধপরিকর এবং এক্ষেত্রে র‍্যাবের পক্ষে দাঁড়ানো তারই পদক্ষেপ বলে কূটনীতিকরা মনে করছেন। এখন প্রশ্ন, শুধুই কি 'বন্ধু দেশ' বলে ভারতের সাহায্য চাইছে বাংলাদেশ? তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, শুধু সে কারণেই নয়, এই ক'বছরে নরেন্দ্র মোদীর সফল কূটনৈতিক দৌত্য এবং ভারতের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশ ভারতের কাছে এই আবেদন করেছে। আমাদের স্মরণে থাকতে পারে, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে গোটা বিশ্ব ভারতের মুখাপেক্ষী ছিল, বাংলাদেশেও সেই আঙ্গিকেই র‍্যাবের ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে। এইখানেই তথ্যাভিজ্ঞমহলের অনুমান, অচিরেই ভারত কূটনৈতিকভাবে বিশ্বশাসন করবে। □

কালিয়াগঞ্জের ঘটনার জন্য পুলিশ নিজেই দায়ী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই এবার জেগে উঠবেন। রাজ্যের শাসকদলের বড়ো, মেজো, সেজো, ছোটো, দু'আনি, একআনি নেতাদের কয়লাচুরি, বালিচুরি, গোরুচুরি, চাকরিচুরি, বিভিন্নখাতে কেন্দ্র সরকারের দেওয়া টাকা চুরি করার পর জেলযাত্রা দেখে তারা এতদিন লেজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকে আছেন। এখন তারা জেগে উঠবেন কারণ হিন্দুরা প্রতিরোধের রাস্তায় নেমেছে। কেন এই নির্জীব কেঁচোরা ফণা তুলল এবং খোদ শাসকের একনিষ্ঠ সেবককেই ছোবল মারল সেটাই একটু দেখে নেওয়া যাক।

জানা গিয়েছে নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠে উত্তরদিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ। উত্তেজিত জনতা কালিয়াগঞ্জ থানার ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পোড়ানো হয় কয়েকটি গাড়ি। পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেলও। জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। হামলার অভিযোগে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে।

ঘটনার বিবরণ— কয়েকদিন আগে কালিয়াগঞ্জের সাহেবডাঙায় পুকুরের পাশ থেকে এক রাজবংশী কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যদিও পুলিশ সুপারের দাবি কীটনাশকে ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এমনকী ধর্ষণের অভিযোগও তিনি স্বীকার করেননি। সেকারণে কালিয়াগঞ্জ থানা অভিযান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল রাজবংশী তপশিলি জনজাতি সমন্বয় কমিটি। ওই কর্মসূচি থেকে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়। ওই কমিটির তরফে বহু মানুষ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে থানা অভিযান করেন। থানার সামনে পুলিশের তৈরি তিনটি ব্যারিকেড আন্দোলনকারীরা ভেঙে দেওয়ার সময় পুলিশ বাধা দেবার চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। তখন আন্দোলনকারীরা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারপর তারা থানায় ঢুকে লাঠিসোটা নিয়ে ভাঙচুর শুরু করে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় থানার ব্যারাকের একটি অংশে। সেই আগুনে পুড়ে যায় থানায় রাখা একাধিক গাড়ি। পুলিশ পালটা লাঠিচার্জ শুরু করলে কয়েকজন আন্দোলনকারী জখম হন।

> **যারা শিবলিঙ্গে, ত্রিশূলে কন্ডোম পরাতে অভ্যস্ত, যারা বিএসএফ-কে ধর্ষক সাজিয়ে তৃপ্তিলাভ করেন তারা বরাবর হিন্দু কন্যাদের নির্যাতনে চুপ করে থেকে মজা উপভোগ করেছেন।**

ইতিপূর্বে রাজ্যবাসী বহুবার পুলিশকে পিটুনি খেতে, টেবিলের নীচে, আলমারির পাশে ফাইল দিয়ে মাথা বাঁচাতে দেখেছে এবং দুষ্কৃতীর বাড়িতে পুলিশ মারফত চাল, ডাল, আটা, তেল, সবজি পৌঁছে দিতে দেখেছে। তাতে সবাই মেনে নিয়েছিল যে পুলিশের থানা পোড়ানো বা পুলিশকে পেটানোর একমাত্র হকদার দুধেল গোরু সম্প্রদায়। কিন্তু এবারে আধমরাদের ফণা তোলা দেখে সবাই আশ্চর্য। প্রশ্ন উঠেছে এও কি সম্ভব? উত্তরে কেউ কেউ বলছেন, হ্যাঁ, সম্ভব হয় বইকী। মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায়, পরিবারের প্রিয়জনেরা যখন আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে, পুলিশ যখন চোখ বুঁজে থাকে, প্রশাসন যখন শাসকের পদবন্দনায় ব্যস্ত থাকে এবং স্বয়ং শাসক যখন শয়তানকে মাথায় তুলে নাচনকোদন করে তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেক যাওয়া কেঁচোর মতো মানুষদের শিরদাঁড়া তৈরি হয় এবং তখন তাঁরা ফণা তুলতে পারে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে।

বিগত ৩৪ বছর যাবৎ এই রাজ্যের হিন্দুরা মারের পর মার খেয়েছে। পরিবর্তনের পর তারা আশা করেছিল এবার হয়তো শান্তিতে থাকা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং প্রকাশ্যে দুধেল গোরুদের উৎসাহিত করা হয়েছে তাদের পিষে মারার জন্য। তাতেই এরাজ্যে হিন্দু কন্যাদের ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা করাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ। মনে করে দেখুন সেই পার্কস্ট্রিট কাণ্ড থেকে শুরু করে কামদুনি, নদীয়া, হাঁসখালি, কুশমণ্ডি হয়ে কালিয়াগঞ্জ এবং আরও বহু বহু জায়গার ঘটনাগুলোর কথা। সর্বত্রই হিন্দু কন্যার ধ্বংস সাধন।

একথা অস্বীকার করে তো লাভ নেই

ফঃ ২

বর্তমানে রাজ্যে যতরকম হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ চলছে তার পাণ্ডাদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগের ওপর দুধেল গোরু সম্প্রদায়ভুক্ত। ট্রেন-বিমান ধ্বংস হোক, ছিনতাই ডাকাতি অপহরণ হোক, তীর্থযাত্রীদের হত্যা করা হোক— বা হিন্দু কন্যাদের ধর্ষণ ও হিন্দুদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হোক— সবই দুধেল সন্ত্রাসীদের কাজ। তারা হয় ভারতীয়, নতুবা ভারতীয় দুধেল গোরু এবং সরকার আশ্রিত পাকিস্তানি, বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা নামক দুধেল গোরু। মুসলমানদের হোটেলে তারা আস্তানা গাড়ে, মসজিদে আশ্রয় পায়, মুসলমান পাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজের ছক কষে, কুকার্য সাধন হলে মুসলমান পাড়াতেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে। ধরা পড়লে বাড়িওয়ালা ন্যাকা সাজে, হোটেলওয়ালা বোকা বনে যাওয়ার ভান করে, মসজিদের ইমাম ধর্মভীরুর রূপ ধরে। এমনকী সন্ত্রাসীদের পিতামাতা ভ্রাতারাও অজ্ঞানতার আশ্রয় নেয়। তাদের ভাড়াটিয়া, মসজিদের নেমাজি, হোটেলের বাসিন্দা, এমনকী পুত্র বা স্বামী বা ভাই যে জঙ্গী কাজের সঙ্গে যুক্ত তা নাকি তারা জানতেনই না। এখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় তারা নাকি মরমে মরে যাচ্ছেন।

সুতরাং, একদিকে কাশ্মীর থেকে কেরল, মহারাষ্ট্র থেকে মণিপুর-পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত চলছে বছরের পর বছর হিন্দুকন্যা ধর্ষণ ও হত্যা। বাংলাদেশে সরকারি মদতে যেমন নিরুপায় হিন্দু নরনারী হচ্ছে নির্যাতন ও পাশবিকতার শিকার, তেমনি এ রাজ্যে ২০১১ সালের পর থেকে সরকারি অনুপ্রেরণায় চলছে পৈশাচিক বর্বরতার অনুষ্ঠান। তার বিরুদ্ধে কাউকে কোনো প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। না মুসলমান নেতারা, না সেকুলারি হিন্দুরা। সবাই যেন তামাশা দেখছিল।

তার ফলে হিন্দুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে কি দোষ দেওয়া যায়? হিন্দু সমাজে নাথুরাম সৃষ্টির প্রেরণা কিন্তু সেকুলার হিন্দু নেতারাই দিচ্ছে। তারা একটু সাবধানে থাকবেন। তাতে নিজেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল। তালিবান সৃষ্টিতে মদত জোগাবেন, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের প্রেরণা দেবেন, আর নাথুরামেরা চোখ-কান বুঁজে বসে থাকবে, তা হয় নাকি!

এক সময় সরকারি মদতে মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু, সাঁইবাড়ি হয়ে ধানতলা, বানতলা, নদীয়ার পর সরকার বদলের পর পুনরায় নতুন উদ্যোমে যে হিন্দু কন্যাদের ধ্বংসসাধন শুরু হয়েছে তা দেখে যে সমস্ত হিন্দুর ধমনীতে প্রকৃতই মানুষের শোণিত প্রবাহিত, তাদের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই থানা আক্রমণ। কিন্তু যেসব বেজাত-বজ্জাত বুদ্ধিজীবী ও সেকুলারদের মগজে শয়তানের বাসা আছে, যারা শিবলিঙ্গে, ত্রিশূলে কন্ডোম পরাতে অভ্যস্ত, যারা বিএসএফ-কে ধর্ষক সাজিয়ে তৃপ্তিলাভ করেন তারা বরাবর হিন্দু কন্যাদের নির্যাতনে চুপ করে থেকে মজা উপভোগ করেছেন। কালিয়াগঞ্জের পুলিশ যেভাবে নাবালিকা কন্যার উলঙ্গ মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে, সে দৃশ্য নির্মমতার নিকৃষ্ট নজির। কেন পুলিশের ওপর জনতার রোষানল বর্ষিত হলো তা ভেবে দেখা উচিত। যদিও পুলিশের ওপর আক্রমণ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

তথাপি বলতেই হয় এই ঘটনার জন্য দায়ী পুলিশ নিজেই। পুলিশ বরাবর তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত না করে প্রমাণ লোপাট করছে। ফলে সেখানকার মানুষ ক্ষেপে গিয়েছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা যে তলানিতে ঠেকেছে তা রাজ্যের শিশুকল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্যেই পরিষ্কার। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের আগেই তিনি বিবৃতি দিচ্ছেন যে বিষ খেয়ে মারা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের কঠিন শাস্তিদানের জন্য। যা তিনি পারেননি হাওড়া, রিষড়া, ডালখোলায় রামনবমী মিছিলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে। তবে এবার আমরা দেখতে পাব রাজ্যের তথাকথিত ঘুমন্ত সেকুলারদের জেগে উঠে বীর বিক্রমে পথে নামতে।

হিন্দু কন্যাদের সুরক্ষার জন্য রাজ্যের দু-একটা থানা পুড়িয়ে বা দু-চারজন পুলিশ পিটিয়ে কোনোরকম সুরাহা করা যাবে না। এ রাজ্যে হিন্দু কন্যাদের রক্ষা করতে চাইলে উচ্চ-নীচ, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি প্রভৃতি মতবাদে বিভক্ত সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে একজোট হয়ে হিন্দু-বিরোধী, দুধেল গোরুপ্রেমী সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। নচেৎ কোনো দলেরই হিন্দু এবং হিন্দু কন্যাদের দুর্ভোগ বন্ধ হবে না।

With Best Compliments

from -

A

Well Wisher

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির উদাসীনতার কারণটা রাজনৈতিক

সুদীপ্ত গুহ

একটা বিতর্ক দানা বাঁধছে যে নতুন প্রজন্ম বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীন। সংবাদমাধ্যমে (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক) মাঝে মাঝেই এই নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। কিন্তু একথা বলছেন কারা? তারাই যাদের জীবন এবং জীবিকা বাংলা ভাষার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে দাঁড়িয়ে। এক সময় টিভিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা আক্ষেপ করে গেছেন যে বাঙ্গালি কেন বাংলা পড়ে না। আজ সেই আক্ষেপ করতে দেখা যায় দুই ধরনের মানুষকে। (১) সুনীলবাবুর উত্তরসূরি অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষার উপর সরাসরি নির্ভরশীল। যেমন, গীতিকার, সুরকার, লেখক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র শিল্পী এবং স্বঘোষিত থিয়েটারকর্মী প্রমুখ। (২) কিছু রাজনীতিবিদ যাদের জন্য আমাদের রাজ্য সারা দেশের নিরিখে পিছিয়ে যাওয়ায়, তারা শেষ অবলম্বন করেছেন এই বাঙ্গালি আঞ্চলিকতাবাদকে। কিন্তু বাকি সমাজ, অর্থাৎ যারা উপরোক্ত পণ্য বা পরিষেবার ভোক্তা? যারা ওই রাজনৈতিক নেতাদের ভোটার? তারা কিন্তু এই ব্যাপারে বেশ উদাসীন। কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার তাঁর কলমে এই উদাসীনতা খুব সহজভাবে তুলে ধরেছেন 'বাংলাটা ঠিক আসে না' কবিতায়। কিন্তু এই সমস্যার কারণ কী? অর্থনীতির ভাষায় বাংলা ভাষাকে যদি একটি পণ্য বা পরিষেবা (Goods or Services) হিসেবে ভাবি, তবে তা কেন বাজারে দাম পাচ্ছে না তাঁর একটা চাহিদা ও জোগান বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

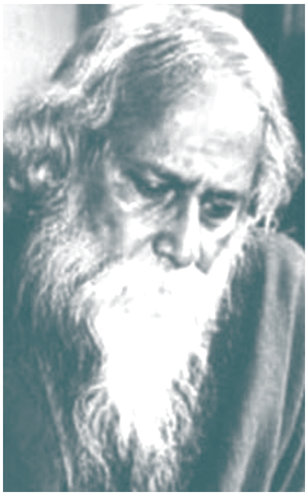

তবে, চাহিদা এবং জোগানের আগে বাজারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক। এক সময় রবি ঠাকুরের মৃত্যুর এক দশকের পরই বাংলার সাহিত্য সাংস্কৃতির কেন্দ্র এবং অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর শ্যামল মিত্র থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেকেই বলেছেন, কার জন্য আমরা আর কাজ করবো? উত্তম কুমারের মৃত্যুর (১৯৮০) পরেও প্রায় একদশক বাংলা সাহিত্য, কবিতা, গান, নাটক, থিয়েটার, যাত্রা, পুজো সংখ্যা, পুজোর গান, পাড়ায় পাড়ায় গানের জলসা এবং অবশ্যই বাংলা সিনেমার বাজার ভালোই ছিল। আশির দশকেও অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্রদের সিনেমাকে বাংলা ডাব করে দেখাতে হয়েছে, কারণ বাংলা সিনেমার তখনও একটা বাজার ছিল। বাংলা সিনেমা 'শত্রু'র রিমেক করেন বলিউডের সুপারস্টার রাজেশ খান্না। শনিবার দুপুরে বিবিধ ভারতীতে সরকারি না/স্টার থিয়েটারের নাটক বা নট্ট কোম্পানির যাত্রার বিজ্ঞাপন হতো দশ থেকে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত। এটা প্রমাণ করে নাটক, থিয়েটার এবং যাত্রার দর্শক ভালোই ছিল। পুজোয় নতুন গান এবং সিনেমা পেতাম আমরা। পুজো সংখ্যা ম্যাগাজিন হট কেকের মতো উধাও হয়ে যেত। কিন্তু আশির দশকের শেষ থেকেই বাংলা সাংস্কৃতির প্রতিটি স্তম্ভই তাঁদের জমি হারাতে থাকে। তবে খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সত্তরের দশক থেকেই মান পড়তে থাকে। পরবর্তীকালে, ২০০৪ থেকে ২০১২-১৩ কিছু ভালো কাজ হয়, কিন্তু

বাজার ততক্ষণে শেষ। ২০১৫-১৬ থেকে বাজার আবার খুব দ্রুত পড়তে থাকে।

প্রথমে বিশ্লেষণ করা যাক চাহিদার। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর সেই বিখ্যাত লাইন 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবীর গদ্যময়' সাংস্কৃতিক জগতের চাহিদার বিশ্লেষণের শেষ কথা। পেটে খিদে থাকলে, না কেউ সিনেমা দেখবে, না মন দিয়ে গান শুনবে, পড়বে না উপন্যাসও। এখন সোনার বাংলা কীভাবে ক্ষুধার রাজ্যে পরিণত হলো ষাটের দশকের শেষ থেকে, তার উপর কয়েক লাইন না লিখলে এই নিবন্ধ পূর্ণতা পাবে না। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকেই বাঙ্গালির জীবন এবং জীবিকায় অস্থিরতা গ্রাস করে। শুরু হয় গণ-জাতীয়করণ। দেশ ছাড়তে শুরু করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। চা বাগান থেকে পাটকল সর্বত্র। মালিকানা আসে কিছু ভারতীয় অসৎ ব্যবসায়ীর কাছে। এঁরা মানত না কোনো শ্রমিক আইন। Enforcement of contract এঁদের শব্দকোষের মধ্যে ছিলই না। ফলে প্রভাব পড়ে চাকুরিজীবী এবং ছোটো বাঙ্গালি ব্যবসায়ীদের উপর যারা ওই বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করতেন বা তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। কমতে থাকলো মাইনে। চাকরির শর্ত খারাপ হতে থাকল এবং বহু ক্ষেত্রেই ছাঁটাই হাওয়া শুরু হলো। চা বাগান এবং পাটকলে বছরে পাঁচ চয় মাস বেতন বন্ধ হলো শ্রমিকদের। যারা ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করে ৩০ থেকে ৪৫ দিনে পেমেন্ট পেতেন, তাঁদের গড় পেমেন্ট পাওয়ার সময় বেড়ে দাঁড়ালো প্রথমে ১২০ থেকে ১৮০ দিন। পরবর্তীকালে পেমেন্ট না পেয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হলো। ওদিকে সরকার রাজস্ব আয়ের একটা বড়ো অংশ জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে খরচা করতে গিয়ে কোপ পড়ে উন্নয়নে। কমে গেল চাকরি। রাজ্য পরিণত হয় ক্ষুধার রাজ্যে। বলাইবাহুল্য, তা গদ্যময়। উত্তাল হয় রাজ্য অতিবাম রাজনীতিতে। এখন অন্য রাজ্যে কী প্রভাব পড়েনি? পড়েছে। কিন্তু ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বড়ো গাছের। সিনেমা, নাটক, থিয়েটারের বাজার খারাপ হতে থাকে। যদিও সাহিত্যের বাজার অর্থাৎ ম্যাগাজিন, উপন্যাস, কবিতার পাঠক তখনও কমেনি। রাজ্যে যত শিল্প বাণিজ্য কমতে থাকে, বাজার তত সমান্তর প্রগতিতে কমতে থাকে। কিন্তু এই অধগতি গুণোত্তর প্রগতির আকার নেয় ১৯৯০ থেকে, যার মূল কারণ ১৯৮২-তে রাজ্য সরকারি স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া এবং রাজ্যে কম্পিউটার আসতে না দেওয়া। ইংরেজি তুলে দেওয়ায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি তাঁদের সন্তানদের পাঠাতে থাকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। নতুন প্রজন্ম বাংলার সাংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে থাকে। বাংলা পড়ার অভ্যাস কমতে থাকে। গিরীশ ঘোষ বা শিশির ভাদুড়ী বা উত্তম কুমারকে তারা নিজেদের সঙ্গে মেলাতে পারে না। ১৯৯১-এর পর সারা দেশ যখন এগিয়ে যায়, তখন উচ্চ মেধা ও অধিক উদ্যোগী বাঙ্গালি রাজ্য ছাড়া শুরু করে। যারা থেকে যায়, তাঁদের কাছে পৃথিবী গদ্যময়, যা আগেই বললাম। বাঙ্গালি প্রেক্ষাগৃহবিমুখ হলো।

এবার আসি জোগান বিশ্লেষণে। সাংস্কৃতিতে একটা নতুন ধারা এলো পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই। যারা অতীতকে অস্বীকার করা শুরু করলো রাজনৈতিক কারণে। সোজা কথা চেষ্টা করেন অতীতকে ভুলিয়ে দিতে। এঁরা অনেকেই বেশ মেধাবী এবং মানুষ তাঁদের গ্রহণ করেন একটা সময় পর্যন্ত। বংশ পরিচয়ে এদের একটা বড়ো অংশ ব্রাহ্ম সমাজ এবং খ্রিস্টান ধর্ম থেকে এসেছেন এবং সনাতনী ভারতীয় সাংস্কৃতির বিরোধী। ভাষা, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে এঁরা ১০০ শতাংশ সনাতনীদের মতোই, কিন্তু ভাবাদর্শে বিরোধী। এদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে সোভিয়েত রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি। কিন্তু একটা সময়ের পর, নতুন মতাদর্শ আমদানি করতে গিয়ে তাঁরা সাহিত্য, কবিতা, গান এবং তার সুর, নাটক, কবিতা, থিয়েটার, যাত্রা সব কিছুর সর্বনাশ করে দিলেন প্রচলিত ব্যাকরণ ভেঙে দিয়ে। কীভাবে?

স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রাশচেভ এবং বুলগানিন ভারত দেখলের পরিকল্পনা করে। কীভাবে? যুদ্ধ করে? না। পদ্ধতির নাম ছিল সাবভার্সন। হীরক রাজার ভাষায়, ওঁদের নিজের দেশে 'আজীবন কারাবাস' কিংবা 'মুণ্ডোচ্ছেদে প্রাণনাশ' শাস্তি হলেও, বিদেশের জন্য তারা 'প্রাণে মারে না', 'গারদের ধার ধরে না', 'শূলে চড়ায় না', 'জ্যান্ত পোড়ায় না'। পদ্ধতি একটাই। মগজ ধোলাই বা মস্তিষ্ক প্রক্ষলন। যা তাঁদের ভাষায় 'সাবভার্সন'। কিন্তু মগজে কি ঢোকানো হতো? বোঝানো হতো, 'তোমাদের সব ভুল। তোমাদের সব মিথ্যা। তোমার অতীত, দর্শন, অধ্যাত্ম, সাহিত্য, সংগীত ব্যাকরণ, সমাজব্যবস্থা, বিবাহরীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান সব ভুল। তোমার পূর্বপুরুষ ভীরু এবং পরাজিত।' শিক্ষা, সাংস্কৃতি, মিডিয়া জগতে দেশি এজেন্ট নিয়োগ করা হলো যারা এটা বোঝাবেন সাধারণ মানুষকে। তৈরি হলো কিছু স্কুল, যাতে ভবিষ্যতে কেজিবির অবর্তমানেও তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। শুরু হলো অতীত যোগসূত্র কেটে দেওয়ার যাত্রা, যাতে নতুন মতাদর্শ মাথায় ঢোকানো যায়। আর এখানেই শুরু হলো কিছু মূল টেকনিকাল সমস্যা, যা উৎকর্ষ এবং গ্রহণযোগ্যতা কমাতে থাকলো প্রতিটি সৃষ্টির। কি সেই সমস্যা?

উপন্যাস, কবিতা গান এমনকী শব্দ কিছু উপমা বা অলংকার দাবি করে উৎকর্ষের জন্য। যার অবর্তমানে, পরিবেশন অনেকটা লবণহীন খাবারের মতো হয়ে যায়। আর অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, উপমা আসবে কোথা থেকে? কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো শুরু করা যাক। প্রথমে আসি উপমা কেন প্রয়োজন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধঘ কাব্য'। রামায়ণের ঘটনার উপর একটি পরীক্ষামূলক (Experimental) সৃষ্টি। অথচ উপমা হিসেবে মহাভারত এবং পুরাণের বিভিন্ন ঘটনা বার বার এনেছেন মধু কবি, যা রামায়ণের অনেক পরের যুগে লেখা। বাংলা ভাষা এবং সাংস্কৃতির সুবর্ণযুগে এমন কোনো কবি নেই যিনি উপমা ব্যবহার করেননি। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় বহু পৌরাণিক চরিত্র এবং ঘটনাকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কবি নজরুল বা মধুকবি যদি অতীতকে অস্বীকার করে তাঁদের কবিতা লিখতেন, তাহলে কী তাঁদের সৃষ্টি অমরত্ব লাভ করতো? কিন্তু এই অতীতবিহীন সাহিত্য নিয়ে নিরীক্ষা করতে গিয়েই শুরু হলো উপমাহীন অন্তঃসারশূন্য

কবিতা/গানের যুগ। কিছু গায়কের একটা দুটো ক্যাসেট মানুষ গ্রহণ করেছে এবং সেটা ভাঙিয়েই সারা জীবন মাচায় বা কলেজের অনুষ্ঠানে কাটিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য কিছু রাজনৈতিক মন্তব্য ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রেখেছেন। একটা সময়ের পর, তাঁদের সৃষ্টি মানুষের কাছে একঘেঁয়ে লেগেছে বলেই পরে তাঁরা আর সাফল্য পাননি। পুজোর সময় আজও মাইকে বেজে ওঠে সেই সুবর্ণ যুগের গান। যারা সেই গান বাজান, তারা সেই যুগে জন্মানওনি। অথচ, গত দুই তিন দশকে হিট হওয়া গান আর বাজে না।

এবার আসি সিনেমা/যাত্রা/নাটকের গানে বা কবিতায় রূপকের ব্যবহার প্রসঙ্গে। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। 'সাড়ে চুয়াত্তর' উত্তম কুমার সুচিত্রা সেন অভিনীত প্রথম ছবি, যা তাঁদের নক্ষত্র বানায়। দুজনের প্রথম সংলাপ একটি দূরাভাষ যন্ত্রে দুই জনের কথাকাটাকাটি থেকে শুরু। এর পরের দৃশ্যতেই অভিনেতা এবং গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সেই কালজয়ী ভক্তিগীতি 'এ মায়া প্রপঞ্চময়'। রূপকের আশ্রয় নিলেন কবি। এক গান দুই মানে। একদিকে শুনে মনে হবে ভগবতপ্রেমের রস, অপরদিকে প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের ভবিতব্য, মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে কবির কবিতায়। যেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বাল্যালঙ্কার। এবার আসি 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রসঙ্গে। সম্পূর্ণ হাস্যরসের প্রেমের ছবি। এখানে পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে গ্রামবাংলার এক যুবক এবং এক যুবতীর ভালোবাসার গল্প। কাহিনিতে আছে সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা, পৌরাণিক নিয়মনীতিরও সমালোচনা, আবার ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি থেকে প্রেমের জয়গান। ছবিতে তিনটি গান। একটি শৈব ঘরানার, একটি বৈষ্ণব ঘরানার এবং একটি শাক্ত। সঙ্গে অপ্সরাদের নাচ। যাকে ভূতের ভবিষ্যতের সেই অয়ন সেনগুপ্তর (পরমব্রত) মতে বলা চলে সত্যিকারের Layered Film। এখানেই একজন স্রষ্টার সাফল্য, যা তার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করেছে।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যতই সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবুক, প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভালো-মন্দ বোঝে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই সংস্কৃতি। আর বাজার হারিয়ে নিজেদের তৈরি গর্তে পড়ে আর্তনাদ শুরু করেছে বুদ্ধিজীবীরা যে বাঙ্গালি বাংলা প্রত্যাখ্যান করছে হিন্দি জাতীয়তাবোধের প্রভাবে।

অতীতকে যদি অগ্রাহ্য করা হতো, পৌরাণিক গল্পের সাহায্য না নেওয়া হতো, তাহলে কি এই কালজয়ী সৃষ্টি আমরা পেতাম?

এবার আসি কবিতার শব্দ চয়ন। সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলা হয়। ধরে নেওয়া হয়, ভগবান যেমন একশোর কিছু বেশি মৌলিক পদার্থ থেকে অসংখ্য যৌগিক এবং মিশ্র পদার্থ সৃষ্টি করেছেন, তেমনই কিছু মৌলিক শব্দ থেকে উৎপন্ন হাজার হাজার যৌগিক এবং মিশ্র শব্দ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। যৌগিক শব্দকে বলে প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং মিশ্রকে সমাসবদ্ধ। প্রত্যয়ান্ত শব্দও উৎস অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত যেমন কৃর্দান্ত ও তদ্ধিতান্ত। এই ধরনের শব্দ সাহিত্য, কবিতা, গানের ভাষায় মাধুর্য নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা যদি সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলে ছোটো করার চেষ্টা করি, তবে কোথায় পাবো এই শব্দ-রত্নভাণ্ডার। কোনো শব্দের সমাসবদ্ধ বা প্রত্যয়ান্ত প্রতিশব্দ কীভাবে কবিতার ছন্দ পরিবর্তন করে, তা আমরা বহুবার দেখেছি। মেঘনাদকে কখনো ইন্দ্রজিৎ (কৃর্দান্ত) কখনো রাবণী (তদ্ধিতান্ত) বলে সম্বোধন করেছেন মধুকবি। লক্ষণকে সৌমিত্রি (তদ্ধিতান্ত), স্বরস্বতীকে বীণাপাণি (বহুব্রীহি) বা মহাদেবকে শূলপাণি (বহুব্রীহি)। অমৃতকথা এবং কথামৃত শব্দ দুটির মানে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এর সঠিক প্রয়োগ সৃষ্টির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। আমরা দেখেছি, শশীবাবুর সংসার ছবিতে অরুন্ধতী দেবী এবং ছবি বিশ্বাসের ছন্দ এবং শব্দ চয়ন নিয়ে আলোচনা, কিংবা রবি ঘোষের 'কনে বিভ্রাট' নাটকে পতঙ্গ এবং বিহঙ্গ শব্দ চয়ন নিয়ে নায়ক এবং নায়িকার আলোচনা। এখানে যেটা বলার চেষ্টা করছি, সাহিত্যের যে কোনো ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি মেনে চলা হয়, যাতে সেটা আরও গ্রহণযোগ্য হয়। এমনকি সঠিক প্রতিশব্দ চয়নও বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। কিন্তু আমরা যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করি, কোথায় পাব উপমা? আমরা যদি সবভাষায় মূল দেবভাষাকে মৃতভাষা বলে অবজ্ঞা করি, উৎকর্ষতার সঙ্গে আপোশ করা হয়ে যাবে না তো?

সাহিত্য, কবিতা, নাটক থেকে গান সব ক্ষেত্রেই সব পুরোনো ভেঙে দিয়ে নতুন এক

ধারা আনতে গিয়ে আপোশ করা হয়েছে সৃষ্টির গুণমানের সঙ্গে। যেখানে শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়রা টানা তিন দশক প্রতি পুজোয় আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন, সেখানে আজকের ৯৯.৯৯ শতাংশ বাঙ্গালি জীবনমুখী গায়কদের ৫টা হিট গানের নাম বলতে পারবে না। যাত্রা শিল্প প্রায় শেষ। পুজো সংখ্যা বিক্রি তলানিতে এবং অনেক প্রকাশনী পুজো সংখ্যা বের করছে না টিভিতে রাজনৈতিক ভাষণ দিতে আসা কবিদের একটা কবিতার প্রথম ২ লাইন ৯৯.৯৯ শতাংশ বাঙ্গালি বলতে পারবে না? পাঠক বা দর্শক বা শ্রোতাকে আজকের কবিতা, গান কেন আকর্ষণ করে না?

আগেই বলেছি, পঞ্চাশের দশক সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যোগ হয় সরাসরি রাজনীতির প্রভাব। থিয়েটার শিল্প মূলত বামপন্থী রাজনীতির প্রচার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষামূলক তথা Experimental নাটক তৈরিই হয় কিছু খারাপ মানুষকে ভালো এবং ভালো মানুষকে খারাপ হিসেবে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। যেমন কীচককে দ্রৌপদী প্রেম নিবেদন করেছে— যদি এমন ভাবে দেখানো হয় এবং তাঁকে যদি কুযুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়, তবে কে সেটা গ্রহণ করবে? কর্ণ, মেঘনাদ এমনকী দুর্যোধনকেও মহৎ বলে এই Experimental সাহিত্যে দেখানো হয়েছে। কিন্তু অভিমন্যুকে কেন দেখানো হয় না? তাঁকে নিয়ে কটা নাটক হয়েছে? এর থেকেই উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অভিমন্যু ছিলেন ধর্মের পক্ষে। তাঁকে কেন সমর্থন করবো? অধার্মিককে নায়ক বানানোই ছিল Experiment। এই ধরনের থিয়েটারকে এক মহৎ শিল্প বলে প্রচার করা হয়েছে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে পুরো থিয়েটার নামক শিল্পের থেকেই ভরসা হারায়। আজকের দিনে থিয়েটারে লোক হয় না, তবু জোর করে চালানোর চেষ্টা করেন কিছু মানুষ। বিশেষ করে কিছু এমন লোক যাদের পেট চলে টিভি সিরিয়াল করে, অথচ লোকসমাজে তারা একটু বেশি সম্মান চান নিজেকে থিয়েটারশিল্পী হিসেবে পরিচয় দিয়ে। একটা দুটো দর্শকহীন থিয়েটারে কাজ চালিয়ে তারা নিজেদের থিয়েটার শিল্পী হিসেবে পরিচয় দেন, যাতে টিভি চ্যানেলে বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডাক পান, রাজনৈতিক বিতর্কে ডাক পাওয়া যায়। কারণ, টিভি সিরিয়াল অভিনেতা হিসেবে পরিচয় দিলে কেউ বুদ্ধিজীবী হিসেবে মানবে না।

সিনেমার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলে সর্বাধিক চলা দশটি হিট ছবির মাত্র দুটি বাংলা। অর্থাৎ বাজার আছে, কিন্তু বাংলা ছবির দর্শক নেই। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামে দক্ষিণী ছবির বাংলা ডাবিং রমরমিয়ে চলছে। কিন্তু বাংলা ছবি চলছে না। মানুষ আস্থা হারিয়েছে। সিনেমাকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে দেখতে মানুষ ক্লান্ত। খুব শ্রদ্ধা রেখে বলছি, বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের পাঁচটি ছবি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। মৃণাল সেনের প্রথম ছবি আটকে দেন স্বয়ং নেহরুজী, যিনি নিজে খুব একটা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হিসেবে নিজেকে দাবি করেননি। গত ২০ বছরে কম করে ২০টা বাংলা সিনেমা এসেছে শুধু লাভ জিহাদ প্রচার করতে। ব্যোমকেশের উপর সিনেমা যেখানে শরদিন্দু মূল কাহিনিতে সোরাবর্দীর অত্যাচারের কথা লিখেছেন, সিনেমায় দেখানো হলো ঠিক উলটো। দক্ষিণ কলকাতার কিছু মানুষ এই সংস্কৃতি মেনে নিতে পারে, কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সিনেমা দেখতে যায় শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য। এইসব অবান্তর অবাস্তব বিষয় নিয়ে ভাবার সময় তাঁদের নেই। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যতই সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবুক, প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভালো-মন্দ বোঝে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই সংস্কৃতি। আর বাজার হারিয়ে নিজেদের তৈরি গর্তে পড়ে আর্তনাদ শুরু করেছে বুদ্ধিজীবীরা যে বাঙ্গালি বাংলা প্রত্যাখ্যান করছে হিন্দি জাতীয়তাবোধের প্রভাবে।

তবে বাংলা সংস্কৃতি শেষ হয়ে যায়নি। এটা একটা সেমিকোলন পড়েছে মাত্র, দাঁড়ি নয়। আবার ফিরে আসবে সেই সুবর্ণযুগ। জনসংখ্যার বিচারে আমাদের থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও যদি তামিল বা তেলেগু ছবি আমাদের ১০০ গুণ বেশি চলে, তবে আমাদেরও আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আছে। কিন্তু কীভাবে? প্রথম কাজ এটা নিশ্চিত করা হবে যে এটা ক্ষুধার রাজ্য নয়। সুযোগ তৈরি করতে হবে। চাই সহজ জীবন। জীবন গদ্যময় হওয়া কাম্য নয়। দ্বিতীয় কাজ, সংস্কৃতির স্তম্ভগুলিকে বিশেষ কোনো রাজনীতি এবং বিশেষ কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ভাবা বন্ধ করতে হবে। দেশের সব আঞ্চলিক ভাষায় যদি ভালো কাজ হয় আমরা পারবো না কেন? তেলুগু, তামিল বা কন্নড়রা তো হিন্দি আগ্রাসনের দোহাই দেয় না? বরং আজ তারা বলিউডকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আমাদেরও সেই জায়গায় নিজেদের নিয়ে যেতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে রবি ঠাকুর/উত্তম কুমারদের যুগ, যেদিন বাঙ্গালি আবার সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ দেখতে পাবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সার্বিক সড়ক উন্নয়নে ভারত সরকারের অবদান

শেখর সেনগুপ্ত

কর্মজীবনে আমার নিয়োগকর্তা দেশের বৃহত্তম ব্যাংক যখন যেখানে দায়িত্ব পালনে পাঠিয়েছে, সেখানে উপস্থিত হতে সড়কজনিত কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি কখনও, এ রকম দাবি করবার হক আমার অন্তত নেই। এমন বহু জায়গায় যেতে হয়েছে ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সাল অবধি, যেখানে সাময়িক আশ্রয় লাভে অসুবিধে না হলেও সেখানকার পথঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির অভাব ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাকে যেন এক ধরনের ছায়াযুদ্ধের শামিল হতে হয়েছে। এরকম কিছু জায়গাতেও পা রাখতে হয়েছে, যেখানে যানবাহনের অভাব বিকট এবং আমি যেন আমার দায়িত্ব সেরেছি বাঘের পিঠে সওয়ারি হয়ে। এখন তো আমি পৌঁছে গিয়েছি জীবনের প্রান্তিক পর্বে, যখন চলছে যুগপৎ কেবল পঠন ও লিখন স্মৃতিকে অবলম্বন করে। সময় সময় চোখ কেমন ঢুলুঢুলু এবং তখনই আমার ভাবনায় উড়ে আসে সেই বাসনা— ভারতের যে সকল অঞ্চলে এক সময়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, সেই বহুলাংশে চলাচলের অযোগ্য এলাকাগুলির বর্তমান চালচিত্র কেমন তা জেনে এলে বেশ হয়। পরিচয় গোপন রাখাটাও অবান্তর হবে না। জায়গাগুলি কেবল আদিম নয়, অধিকারীদেরও সেই সময়ে অভাব-অনটন এক রকম কুরে কুরে খেত। কিন্তু তাদের মুখে কখনও অকথা-কুকথা আমি অন্তত শুনতে পাইনি, সম্পর্কিত জটিলতা যতই থাকুক না কেন। সম্প্রতি মনের অন্য সব ইচ্ছাকে দমন করে সেই সময়ের বেশ কিছু এলাকাতেই এলোমেলো ঘুরে এলাম। সত্যি আহ্লাদিত; কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের 'ভারতমালা' প্রকল্পকে অনেকটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। দুর্গম পথ সুগম হয়েছে। জনবসতির বিস্তার যেমন ঘটেছে, তেমনি সড়ক উন্নয়নেও ঘটে চলেছে নীরব বিপ্লব।

১৯৯৮ থেকে ২০২২— এই ২৪ বছরে ভারত সরকার ৩৮৭৯৮ কিলোমিটার সুগম সড়ক নির্মাণ করছেন। এশিয়ান অন্য কোনও দেশ এই কৃতিত্বকে স্পর্শ করতে পারেনি এই সময়ের মধ্যে। প্রতিটি সড়ক নির্মাণের পূর্বে চলেছে সমীক্ষা। অবিভক্ত পরাধীন ভারতের কেউ জন্মজন্মান্তরেও ভাবতে পারতেন বলে মনে হয় না। মনের ওম দিয়ে প্রত্যেকের উচিত এই সাফল্যকে অনুধাবন করা। তাবৎ সমীক্ষাগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেখতে পেলাম, অর্থনৈতিক করিডোরের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো পরিকাঠামোগত সামঞ্জস্যের অভাব। সেই অভাব পূরণের জন্য প্রথমেই যা করা দরকার হয়েছে, তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন, সেটাই জন্ম দেয় 'মহাসড়ক' নামক এক মজবুত সংস্থার। সেই সংস্থারই পরবর্তী নাম 'Organisation And Process Transformation of North And its implementation Agency.' এই প্রতিষ্ঠান এখনও অনলাইন বার্তার মাধ্যমে কড়া নজর রেখে চলেছে দেশব্যাপী সড়ক উন্নয়ন ও নির্মাণে বিশেষত, ভারতের উত্তরাংশে।

প্রথমাবধি খুব জোর দেওয়া হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর। আজ অবধি এই লক্ষ্যে নির্মিত প্রতিটি সড়কের ওপর সরকারি নজরদারি এতটাই অতন্দ্র যে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবার পক্ষে আমার জ্ঞান ও ভাষা দুর্বল। এযাবৎ এই প্রয়োজন মেটাতে সুগঠিত সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার। এদের দৈর্ঘ্য ক্রমশই বাড়ছে। ভারতে সব ধরনের সড়ক উন্নয়নই একরকম ধারাবাহিক— যার বিস্তার কোথাও থমকে নেই। যে পথ একবার তৈরি হয়েছে বৈধ ভাবে, তাকে ধুয়েমুছে ফেলার নজির নেই; বরং তারা পরিবর্ধিত হচ্ছে নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে। তবে এই দায় ও অধিকার কেবল কেন্দ্রের নয়, এ দায়িত্বের অংশীদার প্রতিটি রাজ্য সরকারও। কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নেবেন জাতীয় মহাসড়কের সর্ববিধ উন্নয়নে, —ইংরেজি অভিধায় যাকে বলা হয় Multi modal Logistic Parks। এখানে উল্লেখ্য করিডোরগুলির মাধ্যমে নির্মিত পথের গুরুত্ব নির্মিত হয়ে থাকে। এদের সংখ্যা মোট পথের ৩০ শতাংশ। ভারতের সড়কাদির সর্ববিধ উন্নয়নের যে সার্বিক বিবরণকে আমার চর্চায় পেয়েছি এই মুহূর্ত অবধি, তার সংক্ষিপ্ত হিসেব সারণিতে দেওয়া হলো (সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান)। □

পথ নির্মিতির পরিচিতি	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	ব্যয় এযাবৎ
মহাসড়ক সমূহ	১০ হাজার কি.মি.	১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকা
বন্দর ও উপকূলবর্তী এলাকায়	২ হাজার ৩০০ কি.মি.	৪১ হাজার কোটি টাকা
বাণিজ্যিক সুবিধার্থে নির্মিত সড়ক	৯ হাজার ৫শো ২৫ কি.মি.	১ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি টাকা
যানজট এড়াতে রকমারি দৈর্ঘ্যের সড়ক	৬ হাজার ৭৩ কিলোমিটার	১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা
সীমান্ত এলাকা রক্ষার্থে দুর্গম সড়ক সমূহ	৩ হাজার কিলোমিটার	৩৭ হাজার কোটি টাকা
ফিডার করিডোর	৭ হাজার কিলোমিটার	১ লক্ষ কোটি টাকা
এক্সপ্রেসওয়ে	১২শো কিলোমিটার	৮৫ হাজার কোটি টাকা

উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পথে অন্তরায়

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় নাগরিকদের জাতীয়তাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রতি একাত্মতাবোধ ও নাগরিক সমাজে একতা যে কোনো বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে এক বৈভবশালী দেশ ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু নাগরিক সমাজে একতা ও দেশের প্রতি একাত্মতাবোধ জাগরণে দরকার সমাজে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ও রাষ্ট্রবাদী ভাবনার সম্প্রসারণ। আর মনে রাখতে হবে, জাতীয়তাবাদী ভাবনা সম্প্রসারণে প্রধান অন্তরায় হলো উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ।

ভারত বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মনস্ক বিবিধ জনগোষ্ঠীর দেশ। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য ভারতের পুরনো মতাদর্শ। কিন্তু ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিবিধতা বিভিন্ন সময়ে জনসমাজে বিভেদের বাতাবরণ সৃষ্টি করে যা সামাজিক ঐক্য স্থাপনের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি আমরা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো উলটে যাই, তাহলে দেখব, ভারত বারবার বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল জাতীয় ঐক্যের অভাবে। উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী ভাবনা তৎকালীন ভারতীয়দের নিজেদের ছোটো আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। তাই শক, হুন, পাঠান, মুঘলদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অঞ্চলে সর্বাত্মক ও শক্তিশালী প্রতিরোধ হলেও, বিদেশি শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী জাতীয় প্রতিরোধ দেখা যায়নি মূলত শক্তিশালী জাতীয় ঐক্যের অভাবে। আবার এই উদাহরণও ইতিহাসে আছে, যখন জাতীয়তাবাদী ভাবনা সমাজের সর্বাংশে জারিত হয়েছিল, যখন নাগরিক সমাজ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিল, তখন তাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শক্তিশালী ও অত্যাচারী ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। এটাই একতাবদ্ধ জাতীয়তাবাদী নাগরিক সমাজের শক্তি। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বর্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে কিছু অঞ্চলে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কিছু অঞ্চলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির উত্থান। এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের মধ্যে উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী আদর্শ প্রচার করে ও এই ভাবনায় মদত দেয়। যে ভাবনা ও ভুল আদর্শ অনেক সময় জাতীয় স্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে। আর আঞ্চলিক দলের নেতারা নিজেদের আঞ্চলিক অনুভূতির মসীহা হিসেবে তুলে ধরে জনমানসে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা ভোগ করার চাবিকাঠি হস্তগত করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভ, ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতা দখলের জন্যে আঞ্চলিকতাবাদে মদত দেওয়া ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ধর্ম, বর্ণ, বর্গ, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে এই বার্তা দিতে হবে যে, 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' ভারতের দুর্বলতা নয়, ভারতের শক্তি।

কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ছাড়াও কিছু অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন আছে, যারা উগ্র আঞ্চলিকতাবাদে মদত দেয়। ওই সামাজিক সংগঠনগুলি রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন না হলেও রাষ্ট্রবাদী সংগঠনও নয়। সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির নেতারা জনস্বার্থের চেয়ে তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেন। নিজেদের ও সংগঠনের জনপ্রিয়তার স্বার্থে তাঁরা জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচারের কাজ না করে আঞ্চলিকতাবাদী প্রচার করে।

ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে এ জিনিস বেশিদিন চলতে পারে না। স্বার্থান্বেষী কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন আঞ্চলিক অনুভূতি, চাহিদা ও অধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলন করার নামে যে আঞ্চলিকতাবাদে মদত দেয়, আমাদের মতো রাষ্ট্রবাদী স্বয়ংসেবকদের তার বিরুদ্ধে মতাদর্শ প্রচার করে নাগরিক সমাজে রাষ্ট্রবোধ জাগরিত করতে হবে। সঙ্ঘের বৌদ্ধিক বর্গের অনুষ্ঠানগুলোতে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, একটি মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে তার বিরুদ্ধ মতাদর্শই। ভারতের মতো একটি প্রাচীন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মনে সুপ্ত রাষ্ট্রবোধ আছে। রাষ্ট্রবাদী ভাবনা তাঁদের ডিএনএ-তে অবস্থান করছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু সেটা জাগিয়ে তোলা। ধর্ম, বর্ণ, বর্গ, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে এই বার্তা দিতে হবে যে, 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' ভারতের দুর্বলতা নয়, ভারতের শক্তি। □

অন্ধকারে নিমজ্জমান বঙ্গ

আজ গভীর শোকের দিন। জাস্টিস গাঙ্গুলি জাস্টিস দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদানে পেলেন তিনি ইনজাস্টিস। সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এ দেশ! চাকরি চুরি যেমন হচ্ছিল ঠিক আগের মতো হবে। এখন থেকে চাকরির চুরির দর বেড়ে গেল। দশ লক্ষ টাকা থেকে হতে পারে কুড়ি লক্ষ টাকা বা তার থেকেও বেশি। আজ বঙ্গের গভীরতম দুঃখের দিন। লজ্জার দিনও। এই দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে একজনই ছিলেন জাস্টিস গাঙ্গুলি। তিনি বিচার ব্যবস্থার মহিমাকে মহিমান্বিত করেছিলেন একের পর এক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদেশ দিয়ে। তিনি ছিলেন বিচার ব্যবস্থার অলংকার। আজকের সুপ্রিম কোর্টের আদেশে তাঁর আসন টলমল। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তিনি আর অংশ দিতে পারবেন না। মিডিয়ার ফাঁদে পড়ে তিনি এখন খাঁচায় বন্দি পাখি। জাস্টিস গাঙ্গুলি দেখিয়ে দিয়েছেন মেরুদণ্ড সোজা করে কীভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বিচার করা যায়।

অন্যদিকে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি কীভাবে ঢাকা দেওয়া যায় সরকার সেদিকে সদা তৎপর। জানি না গণতান্ত্রিক সরকার কেন সর্বদা সবদিক দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে। এই সরকারের জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা আছে বলে মনে হয় না। জাস্টিস গাঙ্গুলিকে দুর্নীতির মামলা থেকে অপসারণ করা হয়েছে শুনে জনগণ যেমন দুঃখ পাচ্ছে ঠিক তেমনি এমন আদেশে সরকার ভীষণভাবে উল্লসিত হয়েছে বলে শুনেছি। এখন জনগণ বিচার পাবে কোথায়? বিচারের পথ রুদ্ধ। একের পর এক হাইকোর্টের আদেশকে সুপ্রিম কোর্ট স্থিতাবস্থা দিলে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রতার পথে হাঁটতে শুরু করে। বিচারের বাণী এখন কেঁদে মরে। জানি না এই পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির শেষ কোথায় এবং কবে শেষ হবে? জাস্টিস গাঙ্গুলি ছিলেন জনগণের শেষ আশা ভরসা। এখন থেকে আমাদেরকে দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করে বাঁচতে হবে, অন্যথায় মরতে হবে। মিল্টনের 'পারাডাইস লস্ট'-এর মতো সুনীতি ভার্সেস দুর্নীতির লড়াইতে এখানে দুর্নীতির জয় হয়। জানি না এ বঙ্গ কোন ঘোর অন্ধকার দিকে যাচ্ছে?

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

পুরনো কয়েন যখন বদল হয়

ষাটের দশকে যখন পুরনো কয়েন বদলে নয়া পয়সা চালু হয় তখন আমার ঠাকুমা খুব রাগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কী দরকার ছিল বাপু, পুরানো পয়সার বদলের।' কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি। আমার বয়স তখন প্রায় ১০ বছর। সেদিনের ঠাকুমার বুক চাপড়ানো আমার মনে আছে। তিনি বলতেন, 'কতো সুন্দর হিসেব। ১৬ আনায় ১ টাকা আর ৪ পয়সায় ১ আনা। নতুন মুদ্রার কতটা সুবিধা তা তাঁকে কিছুতেই বোঝানো যায়নি। অনেক পরে আসল সত্য সামনে আসে। তাহলো তাঁর কাছে অনেক মুদ্রা গচ্ছিত ছিল। যা উনি সময় মতো নিজের ইচ্ছাতেই খরচ করতে পারতেন। এখন ওই মুদ্রা সকলের গোচরে এলো। তাঁর এটাই ছিল আসল বিরোধের কারণ। আজ মান্ধাতা আমলের কলেজিয়াম পদ্ধতির পরিবর্তন করতে গেলে যারা বিরোধিতা করেন তাদের অবস্থাটাও আমার ঠাকুমার মতো মনে হয়। হয়তো তাদের হাতে ঠাকুমার মতো কিছু গচ্ছিত সুবিধা আছে তাই বিরোধিতা।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

নবভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার অপপ্রচেষ্টা সময়ে সময়ে বহিরাগত শাসকদের দ্বারা করা হয়েছে, তা সে বক্তিয়ার খিলজী দ্বারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হোক অথবা ব্রিটিশ শাসক মেকলে দ্বারা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের নামে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাই হোক। একটা বিরাট কাল খণ্ড যাবৎ অরাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা ভারতের সনাতনী আত্মা, সংস্কার ও শাস্ত্রকে বিকৃত করে স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের মতো করে সমাজের মধ্যে উপস্থাপিত করেছে, যার ফলস্বরূপ একটা সময়ে জাতপাতের বিভাজন, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি দোষ হিন্দু সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই অন্ধকারময় সময়ে মহারাষ্ট্রের রামজী মালোজী শকপাল ও শ্রীমতী ভীমাবাঈ শকপালের কোল ও জগৎকে আলোকিত করে ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে নবভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন। বাবাসাহেব আজীবন হিন্দু ধর্মের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সর্বদা দোষমুক্ত হিন্দু সমাজ গঠনের জন্য জীবন সমর্পণ করেছেন। এই কারণে ১৯৩৯ সালে পুনেতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবিরে গিয়ে যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সঙ্ঘের মধ্যে সকল স্বয়ংসেবকদের একটাই পরিচয় যে সে হিন্দু এবং সঙ্ঘ শিবিরে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার কোনো চিহ্নমাত্র নেই তখন তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের কাছে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যে জাতিভেদ মুক্ত, অস্পৃশ্যতা মুক্ত, দোষ মুক্ত সৌভ্রাতৃত্বময়

ফ ঃ ৩

ভারতের উদ্‌ঘোষ করে তার বাস্তবিক রূপ সঙ্ঘ শাখায় প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেব দেওরসজী বলেছিলেন 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয় তাহলে পাপ বলে কিছুই নেই।'

সুতরাং বলা যায় বাবাসাহেব আম্বেদকর হিন্দু সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়ে দোষমুক্ত, একত্রিত, সংগঠিত হিন্দু সমাজ নির্মাণের জন্য আজীবন কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আর আজকের ভারত দেখলে সত্যিই উপলব্ধি হয় যে বাবাসাহেবের আজীবন সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। কিন্তু বামপন্থী শক্তিরা বাবাসাহেবকে সর্বদা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতীক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে এসেছে, যাতে হিন্দু সমাজের পিছিয়ে পড়া একটা বিরাট অংশের ভাই-বোনেরা নিজেদের হিন্দু হবার জন্য গর্বিত বোধ না করে এবং সমাজের মধ্যে ভেদ বিভাজন বিলুপ্ত না হয়। কিন্তু আজ এই সকল হিন্দুবিরোধী শক্তিদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে চলেছে। পরিশেষে বলবো জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার পাশাপাশি বাবাসাহেব সমাজে নারীর সম্মান এবং একটি সম্পূর্ণ নেশা মুক্ত সমাজ নির্মাণের আহ্বান জাতির কাছে করেছিলেন। সুতরাং সমাজে নারীর প্রতি সম্মান বাড়লে এবং একটি সম্পূর্ণ নেশা মুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারলেই বাবাসাহেবের প্রতি আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হবে বলে আমার মনে হয়।

—**শুভ শীল,**
শিলিগুড়ি।

শনি কোনো অপদেবতা নন

শিশুকাল থেকে আমাদের বোঝানো হয়েছে যে শনি এক অপদেবতা যিনি মানুষের শুধু অমঙ্গল করেন। এমনকী কোনো খারাপ মানুষ বোঝাতেও শনি বলা হয় কিন্তু এর চেয়ে মিথ্যা ও অন্যায় অপবাদ আর হয় না। এটা বামপন্থীদের অপপ্রচারের ফল। শনি অপদেবতা তো ননই বরং তিনি দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ।

শনি হিন্দু পুরাণের দেবতা। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ অনুসারে শনিকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করা হয়। হিন্দু দেবতন্ত্রে তিনি সবচেয়ে ভুল বোঝা দেবতা, তিনি মানুষের জীবনে নাকি ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন এবং তাঁর উপাসনা করা হলেও মৃদু তিরস্কার করেন। ব্যাপাটা এর ঠিক উলটো।

হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী :

১। শনি হলেন একদিকে হিন্দুদের কর্ম ও ন্যায়বিচারের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা এবং মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজের উপর নির্ভর করে ন্যায্য রায়দান করেন। ২। অন্যদিকে তিনি মন্দের প্রহরী, তাদের দুর্ভাগ্য, দুঃখ দেন ও প্রতিশোধ নেন। ৩। হিন্দু পুরাণ অনুসারে তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ ঈশ্বর। ৪। যেখানে যম একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ন্যায়বিচার প্রদান করেন সেখানে একজন ব্যক্তি জীবিত থাকাকালীন শনি ন্যায়বিচার প্রদান করেন। ভগবান শনি হলেন কঠোর কিন্তু অত্যন্ত মানবতাবাদী ঈশ্বর যিনি মানুষকে কর্মের ফল দেন এবং সেইজন্য সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর এবং ক্রোধান্বিত হতে পারেন। তিনি মানুষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হতে পারেন যদি সে নিম্নলিখিত দোষের অধিকারী হয়;

১। বিশ্বাসঘাতকতা। ২। পিছনে ছুরি মারা। ৩। অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। ৪। নিষ্কর্মা ও অহংকারী। তিনি অন্যায়ের জন্য মানুষকে কষ্ট দেবেন যাতে তারা তাদের খারাপ কাজ থেকে বিরত হয় এবং তাদের উপর মন্দের প্রভার দূর করে আবার শুদ্ধাত্মা হয়ে ওঠে। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবেও বিশ্বাস করা হয় যিনি সৎকর্মকে পুরস্কৃত করেন এবং যারা মন্দ, অধর্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতার পথে চলে তাদের শাস্তি দেন। এইখানেই ভয়ের শুরু।

শনি ভগবান সমস্ত মানুষকে বর্তমানে বেঁচে থাকতে শেখান যাতে তারা কঠোর পরিশ্রম, মান্যতা ও সংগ্রামের পথ অনুসরণ করেই ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করতে পারে। এছাড়াও, আপনি যদি উপরের সমস্ত গুণাবলী অনুশীলন করেন তবে সহজেই জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং সংগ্রামগুলো নির্মূল করা যায়। শনিদেবকে তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু আপনি যদি শুদ্ধ চিত্তে তাঁর উপাসনা করেন তবে আপনার প্রতিটা ইচ্ছা পূরণ হবে। অতএব, আপনাকে অবশ্যই ভগবান শনির কাছে প্রার্থনা করতে হবে মানে ভালো কর্ম করতে হবে।

—**সুদীপ নারায়ণ ঘোষ,**
কলকাতা।

ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতোই সুরক্ষিত

ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে বলেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী স্বয়ং নির্মলা সীতারমন, আমার বিশ্বাস ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের থেকেও সরকার থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং সম্ভবত ৩০ ধারাতেও রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারবে। অর্থাৎ মিশনারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বাইবেল পড়ানো যাবে। আবার মাদ্রাসা বা মক্তব থেকেও কোরান শারিফ এবং হাদিস পড়ানো যাবে। তবে হিন্দুদের পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে। কী চমৎকার! তাই না? আবার দেখুন একজন হিন্দু যদি বৈধ কারণ ছাড়া দুটি বিবাহ করে তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে একজন মুসলমান পুলিশ। যার বাড়িতে হয়তো দুটি বিবি আছে, তারপর বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে যাবে হয়তো একজন মুসলমান পুলিশ যার বাড়িতে হয়তো ৩টি বিবি আছে। পরে যে বিচারক বিচার করে সাজা ঘোষণা করবেন তিনি যদি মুসলমান হন হয়তো দেখা যাবে তার বাড়িতে ৩টি বিবি মজুত আছে। কী সুন্দর ব্যবস্থা। তাই না?

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
বড়বাজার, চন্দননগর।

কোথুরু বস্ত্রশিল্পীরা সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে চান

সুতপা বসাক ভড়

কোথুরু বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ধারণা নেই, অথচ অন্ধ্রপ্রদেশের এই গ্রামীণ শিল্পটি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক ফ্যাশন জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে চলেছে। কৃষ্ণানদীর তীরে ম্যাচেরিয়ার কাছে পালনাড়ু জেলায় অবস্থিত এই গ্রামটি ওই রাজ্যের একমাত্র গ্রাম যা একটি অভিনব পদ্ধতিতে বাঁধনি হ্যান্ডলুম শাড়ি এবং অন্যান্য কাপড় তৈরি করে চলেছে।

বস্ত্রশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি উচ্চস্তরীয় পর্যবেক্ষকের দল কোথরু গ্রামে পাঠায় এবং কোথুরু বস্ত্রশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দেয়। কোথুরুর বস্ত্রশিল্প ও শিল্পীদের আরও বেশি করে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে বস্ত্র মন্ত্রণালয়। বর্তমানে সৌদি আরব, আমেরিকা, ব্রিটেন, ইন্দোনেশিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এই কোথুরু বস্ত্র রপ্তানি হয়ে থাকে।

যদিও ভারতের অনেক স্থানে বাঁধনী শিল্প বিখ্যাত, তবে ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, কোথুরুর নক্‌শা ও বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে অভিনবত্ব, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ, এই কোথুরু বস্ত্রশিল্প যাঁরা নিপুণ হাতে ধরে রেখেছেন, সেই তাঁতিদের এবং শিল্পীদের খুবই অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, কারণ তাঁরা মহাজনদের কাছে দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন, পরিবর্তে মহাজনরা তাঁদের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে।

একজন মহিলা শিল্পী লীলা কোটেশ্বরাম্মা, যিনি একজন কোথুরু নক্‌শা পারদর্শিনী, বলেন যে সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো সংস্থা তাঁদের উৎপাদনগুলি কিনে নেয়, তাহলে তাঁরা এই শিল্পকে আরও উন্নত করতে পারবেন। তার ফলে শিল্পীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। আর একজন শিল্পী ভাঙ্গারা রামারাও জানান, কোথুরু হলো অন্ধ্রের নিজস্ব হ্যান্ডলুম বস্ত্র শিল্প, যা এই রাজ্যে অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না। এলে তিরুমালাইয়া জানিয়েছেন, এই ধরনের বস্ত্র— যেমন শাড়ি, মেয়েদের বিভিন্ন প্রকার পোশাকের কাপড়, পুরুষদের শার্টের, পঞ্জাবির কাপড় এই বিশেষ বাঁধনী পদ্ধতিতে নৈপুণ্য ও ধৈর্যের সঙ্গে বানানো হয়। পারম্পরিক পদ্ধতি বজায় রেখে নতুন নতুন নক্‌শা শাড়িতে ও কাপড়ে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। উদাহরণস্বরূপ, আঠাশ মিটার কাপড় বুনতে প্রায় পাঁচদিন সময় লাগে। মহাজনরা তাঁতিদের এই বাবদ মাত্র দু' হাজার টাকা দেয়। তার মানে তারা রোজ চারশো থেকে পাঁচশো টাকা পায়। এদিকে মহাজনেরা অনেক বেশি দামে সেটি বিক্রি করে।

একটি পোচম্‌পল্লী নক্‌শার শাড়িতে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার কাঁচামাল প্রয়োজন, কিন্তু সেটি বিক্রি হয় দশ থেকে বারো হাজার টাকায়। তাঁতিকে মাত্র দু হাজার টাকা দিয়ে মহাজন প্রত্যেক শাড়িতে কম করে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করে। সেজন্য কোথুরু শিল্পীরা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে চাইছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশেষ প্রশিক্ষকরূপেও কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে দলটি কোথুরু এসেছিল, তারা এখানকার শিল্পীদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বস্ত্র দপ্তরের অধিকারী শ্রীমতী অপর্ণা

দেশমুখের মতে, এই শিল্পীরা কেবলমাত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর নক্‌শাই বানাচ্ছেন না, বিশ্বের দরবারে ভারতের নামোজ্জ্বল করতে চলেছেন। তিনি কোথুরুকে বাঁধনীর একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্য একজন অধিকারী সুধীরকুমার জানিয়েছেন যে উৎকৃষ্ট সুতো ও সিল্ক্ উভয় প্রকার শাড়ি ও কাপড় তৈরিতে নিপুণ এই কোথুরু শিল্পীদের অ্যাপকো (Andhra Pradesh State Handloom Weaver's Corporation) একটি পরিকল্পনা করে আরও সুযোগ দেবে।

আমরা মহিলারা তো কত রকমে পোশাক পরি, সেজন্য আমরাও এইরকম কোথুরু হ্যান্ডলুম শাড়ি, কাপড় সরকারি দোকান থেকে নিতে পারি। তাতে একটি পারম্পরিক বস্ত্রশিল্পকে মান্যতা দিতে পারব, যা ধরে রেখেছেন কোথুরুর মহিলা শিল্পীরা। □

বাতের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

একটা সময় মনে করা হতো বাত রোগটা বয়স হলেই হয়। তবে এখন রোগের কোনও বয়স নেই। কমবয়সেও অনেকে বাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। খুব বিরল কিছু ক্ষেত্রে তিরিশের কোঠার শেষদিকে কিংবা মধ্যচল্লিশে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকের মধ্যেই এই বাতে ভোগার প্রবণতা থাকে। অস্থিওপোরোসিস, অস্থিওআর্থাইটিস রোগ, কিংবা হাঁটুতে প্রবল ব্যথা, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়, এগুলো প্রায়শই চারপাশের লোকজনকে বলতে শোনা যায়। বাতের প্রথাগত চিকিৎসার পাশাপাশি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন যদি অল্প পরিমাণে মাছের তেল ও পালংশাক খাওয়া যায়, তাহলে বাতের ব্যথা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কয়েকদিন আগে ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব সারি থেকে করা একটি গবেষণায় এই তথ্যটি সামনে উঠে এসেছে। এর আগেও একই বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে। অল্প পরিমাণে মাছের তেল বা সাপ্লিমেন্ট ক্যাপসুল হিসেবে যদি মাছের তেল খাওয়া যায়, তাহলে শুধু যে বাতের ব্যথা, প্রদাহ কমবে তাই-ই নয়, পাশাপাশি উন্নতি হবে হার্টের স্বাস্থ্যেরও। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাছের তেল কেন উপকারী? কেন না এতে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড হাড়ের জোড়ের অংশের প্রদাহ (বাতের সমস্যায় হাড়ের জোড়ার অংশগুলি মানে অস্থিসন্ধি ফুলে গিয়ে ব্যথা হয়) সারাতে ও ব্যথা কমাতে কার্যকর। এর সঙ্গে পুষ্টিবিদরা বলেছেন, যেসব খাবার ভিটামিন কে সমৃদ্ধ যেমন কেইল, পার্সলে পাতা, পালংশাক সেগুলোও বাতের রোগীদের খাওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, যাদের ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকার সমস্যা রয়েছে তাদের কিন্তু পালংশাক খাওয়া চলবে না।

আসলে অপর্যাপ্ত ভিটামিনের কারণে শরীরে প্রোটিনের কার্যকারিতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে হাড়ের বৃদ্ধি বা ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়াও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলত বাত হওয়ার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ব্রিটেনের ইউনির্ভাসিটি অব সারির অধ্যাপক ও সহ গবেষক মার্গারেট রেম্যানের মতামত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, বাতের মতো রোগে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস ও ফিজিওথেরাপির সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে এক্সারসাইজের কোনও বিকল্প নেই। আমাদের স্বাস্থ্যের উপর আমরা কী ডায়েট করি, তার অনেকটা ভূমিকা আছে। তাই সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা মেটানোর মাধ্যমেই শরীরের প্রতিটি জয়েন্টের সুষ্ঠু সঞ্চালন করা সম্ভবপর হবে।

যেসব ব্যক্তি স্থূলকায় তাঁদের বাত হওয়ার আশঙ্কা সাধারণের থেকে অনেকটাই বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ তো করতেই হবে, পাশাপাশি ভিটামিন কে যুক্ত লো-ক্যালোরির খাবার খেতে হবে এবং সামান্য হলেও মাছের তেল বা সাপ্লিমেন্ট। আসলে অতিরিক্ত ওজন হাড়ের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করে, ফলে ক্রমশ অস্থিসন্ধি ফুলতে থাকে, এর থেকে ভবিষ্যতে বাত হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

যে কোনও বাতের সমস্যায় সঠিক ডায়াগনোসিসের প্রয়োজন। অবশ্যই বাড়ির লোকদের সচেতন হতে হবে। তবে সবার আগে প্রয়োজন সঠিক ট্রিটমেন্টের। নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই পেইন কিলার জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয়। সেটা না করে রোগের উপযুক্ত কারণ খুঁজে তার চিকিৎসা করানো উচিত। শুধু উপসর্গ নয় রোগের অন্তর্নিহিত কারণ অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। তবে শুধু চিকিৎসা নয়। সঙ্গে ফিজিওথেরাপি এবং বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। মায়জম, কারণ ও লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ। ☐

মোদীর মন কী বাতে উদ্বুদ্ধ নানা মহল

সুমন চন্দ্র দাস

২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর বিজয়া দশমী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কী বাত অনুষ্ঠান শুরু হয়। গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ এই মন কী বাত অনুষ্ঠানের ১০০তম পর্ব অনুষ্ঠিত হলো। ভারতে এবং ভারতের বাইরে এই শততম

পর্বে অনেকেই উদ্বুদ্ধ। অনুষ্ঠানের প্রচার প্রসার এতটাই ব্যাপক ছিল যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তর থেকে সেই ভাষণের অনুবাদ সম্প্রচারিত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে এই অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছিল। দেশের মধ্যে প্রায় ২২টি ভাষায় সম্প্রচারিত হয়েছে। ১১টি আন্তর্জাতিক ভাষায় সম্প্রচারিত হয়েছে।

১০০তম মন কী বাত অনুষ্ঠানের জন্য ইউনেসকোর ডিরেক্টর জেনারেল আউড্রে আজুলে বিশেষ অভিনন্দন জানান। দেশের জন্য ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব তৈরির জন্য এ এক বিশেষ পর্যায়। ইউনেসকো এবং ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও তথ্যের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব থাকবে বলে তিনি আশা রাখছেন।

এই শততম পর্বের নানারকম মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া এসেছে।

হারিয়ানার বিশিষ্ট সুনীল জাগলানজি জেন্ডার রেশিও নিয়ে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেন। সুনীলজী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন আপনি আমাদের প্রদেশে মেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এই হাসির পেছনে যে পানিপথের চতুর্থ লড়াইটা হয়েছিল তার আপনি নেতৃত্ব দেন।

জম্মু-কাশ্মীর থেকে মনজুর আহমেদ প্রধানমন্ত্রীকে পেনসিল স্লেট বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন যে দিন থেকে আপনি আমাদের এই প্রান্তিক এলাকার মানুষের কথা বলেছেন সেই দিন থেকে আমাদের কাজের বৃদ্ধি হয়েছে এবং রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক বন্ধুরাও অনেক উপকৃত হয়েছেন। ২০০০ টাকার গাছ এখন আমাদের ৫০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভোকাল ফর লোকালের এটাই সব থেকে বড়ো সুবিধা।

মণিপুরের বিজয় শান্তি দেবী বলেন পদ্মফুলের আঁশ থেকে জামা কাপড় তৈরির বিষয়ে পরিবেশ বান্ধব ভাবনার বিশেষ উদ্ভাবন হয়। এটা সমাজের জন্য ভীষণ কার্যকারী। এখন ৩০ জনকে নিয়ে কাজ করছি আগামী দিনে ১০০ জনের কর্ম সংস্থান হবে বলে আশা করছেন বিজয়শান্তি দেবী। উল্লেখ্য, এই জামা তৈরির বাজার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মন কী বাত অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে কলকাতায় রাজভবনে পদ্মসম্মানে ভূষিত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দেশ ও জাতি গঠনের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করেন। মন কী চিত্র নামে বিশেষ ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই দিন রাজভবনে। রাজ্যপাল বলেন, ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জন আন্দোলনের প্রশ্নে মন কী বাত অত্যন্ত বড়ো একটি উদাহরণ। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনবদ্য এক সংযোগ গড়ে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং দেশ জাতি গঠনে মন কী বাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দিনে পূর্বাঞ্চলের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মহানির্দেশক ভূপেন্দ্র কাইন্থোলা বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগের একটি বিশেষ মাধ্যম হলো মন কী বাত। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিশেষ আবেগ জুড়ে রয়েছে।

চলচ্চিত্র জগতের তারকা মহলে মন কী বাত ১০০ পর্ব ছিল দারুণ হিট। চিত্র পরিচালক একতা কাপুর বলেন প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ ভীষণ প্রভাবশালী। বেশ ভালো লেগেছে অনুষ্ঠান। চাকরির নিয়োগ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। চিত্র পরিচালক রোহিত শেট্টি বলেন আমি রীতিমতো উদ্বুদ্ধ হয়েছি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। একজন পথ প্রদর্শকের মতো পথ দেখাচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর এই জন্যই আর কিছু অসম্ভব নয়। অভিনেতা শাহিদ কাপুর বলেন মোদীজী সব সময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান। এটা একটা আদর্শ নেতার বড়ো গুণ। উদ্বুদ্ধ হয়েছি। অনুষ্ঠানে এসে গর্বিতবোধ করছি। অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত বলেন আমি ভীষণ খুশি। মানুষের সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই উদ্যোগে আমি মুগ্ধ।

দেশের কোণায় কোণায় সব সময়ই লাইভ 'মন কী বাত'

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা কোনো বিরতি নেব না। কারণ মানবজাতি যখন একটা কণ্ঠ একটা আবেগ, এক সামগ্রিকতার আহ্বানে জোয়ার স্নাত হয়, যখন একজন রাজনীতিকের অরাজনৈতিক রাষ্ট্র— একাত্মতাবোধ নির্ভর সুললিত বার্তায় সবাই থমকে যায় তা ভাষণের সময়টুকু, হয়তো শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার আবেদন চলে, চলতেই থাকে। সেই কথায়, বলা ভালো কথোপকথন এবং কথায় বার্তাদানে একটুও সময় কাউকে ধার দিতে নেই। তাই তো সবার মনের কথা? নাকি? হ্যাঁ সেটাই সবার মনের কথা। তাই ১০০তম 'মন কী বাত' চলল বিরাম বিজ্ঞাপন ছাড়াই একটানা ৩১ মিনিট ৪১ সেকেন্ড। সব মন কী বাত মানেই অনেকগুলো বিজ্ঞাপনের বিরতিযুক্ত মিনিট। রেডিয়োতে, দূরদর্শনে চলে। কিন্তু তার প্রভাব চলছে এবং বাড়ছে, ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে ২০১৪-র ৩ অক্টোবরের প্রথম পর্বের পর থেকে।

প্রতিমাসে একটা করে মনের মতো সময় এসেছে। এমনি করে যখন ১০০তমতে ৩১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডটা পার হলো— তখন সবাই, বন্ধু শত্রু সবাই অনুভব করল— হ্যাঁ এ কোনো সাধারণ রেডিয়ো এপিসোড না। এ আত্মার আহ্বান। ভারতবাসীকে একসূত্রে গাঁথার বার্তা। এ এক এমন 'মন কী বাত' যা নিভৃতে ফিস ফিস করে ভারত আত্মার বার্তাই দিয়ে গেছে। আরও দেবে। যা কেবলমাত্রই শ্রোতার সংখ্যাতে বিশ্বের সর্বোচ্চ অঙ্কের নয়। যা উপলব্ধির ট্রান্সমিটারের দৃষ্টান্তমূলক বার্তা জনসংযোগ যা ভারত ভূ-খণ্ডের ৯২ শতাংশ অংশ এবং জনসংখ্যার ৯৯.২০ শতাংশকে ছুঁয়ে গেছে। এ যে সত্যিই আমাদের সবার 'মন কী বাত'। যার উদ্দেশ্য আসমুদ্র হিমাচলকে একই আত্মিক উপলব্ধিতে আবদ্ধ রাখা। ২০১৪-র বিজয়াদশমীর দিন (৩ অক্টোবর) যেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম 'মন কী বাত' এপিসোড করলেন— সেদিন মহাত্মা গান্ধীর স্বচ্ছতা অভিযানের সমাজ দর্শনকে সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক দায়িত্ব সবাইকে পালনের আহ্বান জানান রাষ্ট্রের মুখ্য

সেবক নরেন্দ্র মোদী। এ এক অভূতপূর্ব বার্তা— যা রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূরত্বে রেখে রাষ্ট্র নির্মাণে যা হিতকর তা গ্রহণে ডাক দেয় 'মন কী বাত'। ১০০তম পর্বেও নরেন্দ্র মোদীর একই বার্তা ছিল— যার যেটা ইতিবাচক গঠনমূলক তা দল মত নির্বিশেষে গ্রহণ করতে হবে।

পানের দোকান থেকে রাজভবন সর্বত্র যখন একটাই কণ্ঠের শ্রোতা হয় তখন যে তা এক ফল্গুধারার মতো প্রভাব সৃষ্টি করে, তা নিয়ে কোনও দ্বিধা দ্বিমত থাকে না। সে প্রভাব নিজেই তখন প্রচারের মাধ্যম হয়— পৃথক কোনো বিজ্ঞাপন হোর্ডিং কিছুই যে তার লাগে না। সে প্রভাব বিস্তীর্ণ হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মুখ্য দপ্তর পর্যন্ত। তাই ১০০তম পর্বে নিউ ইয়র্ক থেকে টুইটার বার্তা আসে 'Get ready for a historic moment as the 100th episode of PM Modi's 'Mann ki Baat' is set to go live on April 30th in Trusteeship Council Chamber at @ UN HQ!

যখন ফরাসি, ইন্দোনেশিয়ান, টিবেটিয়ান, বার্মী, বালুচি, আরবি ভাষায় সম্প্রচার হয় তখন তা যে অনেকের মন কী বাত তা নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না। অরুণাচলের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে টি পারনায়েক মনের কথাই বলেছেন— শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যেই 'মন কী বাত'। যারাই এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছি তারাই স্বীকার করব, সশক্ত ভারত গঠনের সামগ্রিক আহ্বান এই রেডিয়ো অনুষ্ঠান। যেখান বারবার উঠে এসেছে ভোকাল ফর লোকাল, নারী সশক্তিকরণ, সেলফি উইথ ডটার, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের প্রসঙ্গ। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন প্রান্তিক মানুষেরা। কখনও মালিং গমবু, তো কখনও তাকার তালো। উত্তর পূর্ব ভারতের সীমান্ত গ্রাম জরসিংয়ের গাঁওন বুরহা যখন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভাব বার্তা বিনিময় করেন তখন তার প্রভাব একা গাঁওনের ওপর থাকে না। সমগ্র জনজাতিদের তা হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, কর্মযোগের বিশ্বাস। কমিউনিটি বেসড অরগানাইজেশনে বিশেষ গুরুত্ব বারে বারে দিয়েছে 'মন কী বাত'। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ গঠন করেছে 'মন কী বাত'। যে যোগসাধনে কোনো বিরতি নেই, কার্পণ্য নেই। খামতি নেই উৎসাহের এবং মানুষকে উদ্দীপ্ত করার। মনে পড়ছে, ২৩তম 'মন কী বাতে' প্রধানমন্ত্রী রিওঅলিম্পিকে ভারতের অবস্থান থেকে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মতামত লেনদেন করেন।

সেবার দেশের মেয়েরা অলিম্পিক পদক আনলেও মোদী স্পষ্ট করেন সার্বিক ভাবে মেয়েদের আরও অনেক উন্নতি অপেক্ষমান। এবং সব স্তরে সার্বিক ভাবে খেলাধুলা শরীরচর্চাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করতে হবে তাও বলেন। কখনও দুর্গাপুজো তো কখনও জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কাশ্মীর সমস্যায় উপত্যকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন হয়েছে, চলেছে মত বিনিময়। ডায়লগ-অর্থাৎ মত এবং অভিমত বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের নাড়ি স্পন্দনে পরিচিত হয়ে রাষ্ট্র নির্মাণের রসদ পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ করে চলেছে 'মন কী বাত'।

এক একটি এপিসোড স্ব স্ব ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র। ৯৯তম অনুষ্ঠানে মোদী অঙ্গ দানের আহ্বান করেন। এই জনকল্যাণে যে আনন্দ মন্ত্র লুকিয়ে তার সন্ধান দেন তিনি। অঙ্গ দানের ৬৫ বছর বয়সসীমাও তিনি তুলে দেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে যে সকল দিক পর্যালোচনার প্রয়োজন তার কোনোটাই বাদ থাকেনি মন কী বাতে।

কাশ্মীরের ডাল লেকের পদ্মকানন প্রসিদ্ধ। পদ্ম বৃন্তকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে নাডরু। মোদীর জনপ্রিয়তা পদ্মকাননে এতটাই যে নাডরু রপ্তানির উদ্দেশ্যে কাশ্মীরি পদ্মচাষিরা একটি পি এফ ও গঠন করেন। আনুমানিক ২৫০ কৃষক প্রথম দফায় তাতে যোগ দেন এবং ৯৯তম মন কী বাতে তারা জানান যে তারা বিদেশেও রপ্তানি শুরু করেছেন। যে উপত্যকায় এত সমস্যা ছিল সেখানেও আজ সবাই মনের কথা বুঝতে পারছে। তাই ডোডা জেলার কৃষকরাও ল্যাভেন্ডার উৎপাদনই করছেন না, মন কী বাত বলেছে--- সেই ল্যাভেন্ডার তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যারোমা মিশনের সঙ্গে যোগ করতে পারে। এমন কুচি কুচি হাজার উদাহরণ দেওয়া যায়— মন কী বাতের প্রভাব যে কতটা বিস্তৃত তা বোঝার জন্য। মন কী বাত— আসলে দেশের হৃদস্পন্দন হয়ে উঠেছে। আই আই টি, আই আই এম-এর মতো প্রতিষ্ঠান ডেটা অ্যানালিসিসে জানাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর মন কী বাত সব চাইতে বৃহৎ অনলাইন ইনফ্লুয়েন্স ধরে। স্বচ্ছ ভারত থেকে মুদ্রালোন, গ্রাম থেকে পাহাড়, শিক্ষা থেকে ক্রীড়া, ডাক্তার থেকে হস্তশিল্পী, লক্ষ্ণৌ থেকে মণিপুর ভারতের সব সমস্যা সব সম্ভাবনা সব ভাষা সব জাতি ধর্ম পেশার মানুষের সঙ্গে পরিস্থিতির সঙ্গে যে ভাবে মন কী বাত বারে বারে সংযুক্ত হচ্ছে তা এক ইউফোরিয়া। তা যেমন সমাজ গঠনের কাজ করছে তেমনই মানুষের এক বিশেষ রেডিয়ো হার্ৎজ-এর উন্মাদনা ভরসাকে প্রতিবিম্বিত করছে।

এ যেন এক জাতীয় সেন্টিমেন্টের আকার নিয়েছে। একটা সময় পৃথিবী জানত রেডিয়ো অনুষ্ঠান মানে Talk Radio Show অথবা মাঝরাতের উন্মাদনা ছিল The Jim Bohannon Show। কে জানত যে এক ভারতীয় চা-ওয়ালা মাত্র ৩১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডে একদিন সারা বিশ্বের দরবারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ব্রিটিশ দেশেও প্রশংসার ঢেউ উঠবে— এ কোন হার্ৎযে কথা বলছেন নরেন্দ্র মোদী যা সবার আবেগে কম্পন জাগাচ্ছে! দেশের কথা, মনের কথা শোনার শ্রোতার পরিসংখ্যান জানলে মন নেচে উঠবে আনন্দে। যার নিত্য শ্রোতার সংখ্যা ২৩ কোটি, অতিরিক্ত ৪১ কোটি মানুষ ফুরসত সাপেক্ষ শ্রোতা। ৯৬ শতাংশ মানুষ এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞাত। শ্রোতার ৬০ শতাংশ মানুষ রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন, ৭৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন দেশ ক্রম অগ্রসর।

অধিকাংশ শ্রোতা সরকারি কার্যক্রম সম্বন্ধে জ্ঞাত। ৫৮ শতাংশ শ্রোতার জীবন যাপনের গতি প্রগতিশীল। এবং ৫৯ শতাংশের সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে (তথ্যটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে Snowball Sampling এবং Psychometric purification Survey-র মাধ্যমে করা।) ইন্টারনেট ডেটা প্রায় সবারই হাতের মুঠোয়। তাই টেলিভিশন না পেলেও মন কী বাত হতেই থাকবে, শ্রোতার ঘাটতি হবে না। যা দেশের প্রতিটি প্রান্তিক অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেয়। লিডারশিপের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁর কাণ্ঠ। যে কণ্ঠ Speech signal processing-এর মতো কাজ করে। মহৌষধি হয়ে ওঠে অরগানাইজেশনাল সিটিজেনশিপ বিহেভ গঠনে। একটা ভোকাল কর্ড যেন হয়ে ওঠে Quasi Periodic Singal! যেন এক অর্থবহ কণ্ঠ। মানুষের অটোমেটিক রেসপন্স সিস্টেমকে যে কণ্ঠ এবং তার আহ্বান জোর সাড়া ফেলে। সেই আপাত সহজ কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজটা নিখুঁত ভাবে করে চলেছে 'মন কী বাত'। আর আমরা বাঙ্গালিরা রেডিয়োতে মুগ্ধ হই বছরে একবার। মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে। কণ্ঠে উত্তম কুমারও বাঙ্গালিকে বশ করতে পারেননি। সেই বাঙ্গালিও সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে এখন প্রতিমাসে কণ্ঠে এবং বার্তায় মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছে। তাই মনের কথা এটাই এ অনুষ্ঠানে সত্যিই মনের কথার আওয়াজ পাওয়া যায়।

এক নেতৃত্ব এবং তার মিডিয়ার মাধ্যমে জনমানসে প্রভাব বিষয়ে নানান মডেল এসেছে। আছে। ১৯৫৬-তে কমিউনিকেশন স্কলার ফ্রেইড সাইবার্ট, থিওডোর পিটারসন এবং ইউলবার স্রারম Four Theories of the Press লিখে হই হই ফেলে দেন। অথরিটেরিয়ান থিওরি, লিবারেশন, কমিউনিস্ট এবং সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি থিওরি-এর বাইরে যেন আর কোনো কিছুই হয় না। এর মধ্যেই নেতা এবং তাঁর মিডিয়া এফেক্ট ঘোরাফেরা করতে যেন বাধ্য। কিন্তু এ কি কাণ্ড ঘটাল 'মন কী বাত'! এমন এক স্টাইলেও জনমানসে এত প্রভাব ফেলা যায়! অনেক সময় কথা ওঠে lack of Objectivity-তে মিডিয়া ভোগে। একদম খাঁটি কথা। মন কী বাতকে কি মিডিয়া ক্যাটাগরির মধ্যে রাখা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। কারণ মিডিয়া হলে তার এমন সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকত না। আবার প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর চেয়ে বড়ো মাস মিডিয়া (প্রভাব প্রচার মাধ্যম) এর আগে কখনও একা একজনের অনুষ্ঠান এনেছে বলেতো জানা নেই। মন কী বাত— একটা জার্নালিস্টিক অবজেকটিভিটি খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিমাপ করেছে। অনুভব করেছে দেশের মানুষের চাহিদা। খোঁজ করেছে সীমান্ত থেকে সীমান্তের দিকে। ঠিকানা দিয়েছে এগিয়ে চলার, সহযোগিতার, সহমর্মিতার। বার্তা দিয়েছে এগিয়ে চলার, সহযোগিতার সহমর্মীতার। বার্তা দিয়েছে ভ্রাতৃত্বের। বার বার প্রচার হয়েছে নানান রূপে রাষ্ট্রবোধ জাতীয়তাকেন্দ্রিক চেতনার। একবারও গণনা করা হয়নি মন কী বাত আর ব্যালটের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা।

এ কেবলমাত্রই জাতির মন টিউন করার পর্ব। পর পর পর্ব। অপেক্ষা করছি পরের বিরতিমুক্ত কিছু মিনিট আর বাকি কিছু সেকেন্ডের তরতাজা স্নায়ু সম্পন্দনের জন্য। ■

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' আজ সকলের মনের কথা

ভারতে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা যে অকাশছোঁয়া তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে যে এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় সেটা বোঝা গেল অনুষ্ঠানের শততম পর্বে।

বিমল শঙ্কর নন্দ

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের শততম পর্ব সম্প্রচারিত হয়। আজ থেকে সাড়ে আট বছর আগে ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর একটি রেডিয়ো সম্প্রচার অনুষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত', যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মনের কথা দেশে মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শুরু করেন। তার ১০০তম সম্প্রচার হলো ৩০ এপ্রিল। কেবল সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী এত দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত ভাবে দেশবাসীর কাছে তাঁর মনের কথা নিয়ে হাজির হননি। সাধারণভাবে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটি বড়ো সমস্যা হলো সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব বৃদ্ধি। সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে সরকারকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এই 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান। মানুষ ভোট দিয়ে সরকার গঠন করলেও সরকার পরিচালনা বা গভর্নেন্স তাদের কাছে ছিল এক দূরের বিষয়। কিংবা বলা ভালো সরকার পরিচালনাকে জনগণের কাছে 'দূরের বিষয়' করে রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কী বাত'-এর মাধ্যমে দৈনন্দিন সরকার পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। ফলে অতি দ্রুত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই অনুষ্ঠান। শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিদেশেও।

বিদেশে বসবাসকারী ভরতীয়দের কাছে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আলোচনা করার আগে দেশের মধ্যে এই অনুষ্ঠান কতটা জনপ্রিয় হয়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মূল দায়িত্ব আকাশবাণীর হাতে ন্যস্ত। ২০১৫ সালের আগে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে বিজ্ঞাপনের হার ছিল প্রতি দশ সেকেন্ডে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা। কিন্তু ২০১৫ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের মূল্য বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। 'মন কী বাত' সম্প্রচারের ঠিক আগে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ১০ সেকেন্ডের জন্য দু' লক্ষ টাকা অর্জন করেন বিজ্ঞাপনের মূল্য হিসেবে। অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচের ধারাবিবরণী সম্প্রচারের সময় ১০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনে পাওয়া গেছে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা (দি ইকনমিক টাইমস ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৫)। ২০২৩-এর ৩০ এপ্রিল 'মন কী বাত'-এর শততম সম্প্রচারের আগে রোহতকের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত'-এর রেডিয়ো সম্প্রচার ভারতের ১০০ কোটি মানুষ কোনো না কোনো সময় শুনেছে। প্রায় ২০ কোটি মানুষ নিয়মিত ভাবে এই অনুষ্ঠানটি শোনে। ২০২২ সালের নভেম্বরে দিল্লিতে অবস্থিত সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটি তাদের এক সমীক্ষায় বলেছিল ভারতের ৬০ শতাংশ মানুষ নাকি কখনো এই অনুষ্ঠান শোনেনি। কিন্তু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট রোহতক-এর সমীক্ষা এর বিপরীত কথাই বলেছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অবশ্যই মানুষের মন ছুঁয়েছে। তা নাহলে এতো জনপ্রিয় হতো না।

শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে কতটা জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠান তার প্রমাণ পাওয়া গেল শততম পর্ব সম্প্রচারের সময়। প্রধানমন্ত্রীর শততম 'মন কী বাত' বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভাতীয় দূতাবাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র অবস্থিত ৫টি ভারতীয় কনসুলেটে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। আমেরিকার নিউজার্সিতে স্থানীয় সময় রাত ১-৩০-এ ভারতীয়দের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান একসঙ্গে দেখেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। গায়ানা, পানামা, কলম্বিয়া এবং ডোমিনিকান রিপাবলিক সফর শেষে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউ জার্সিতে গিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন যে ১০ বছর আগে কেউ যদি বলতো যে এত রাতে এত মানুষ একটি অনুষ্ঠান শুনতে হাজির হবেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সঙ্গে থাকবেন কেউ বিশ্বাসই করতো না। জয়শঙ্কর আরও বলেন, 'আপনাদের বুঝতে হবে যে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত'-এর বিপুল প্রভাব পড়েছে, কারণ এটা নয় যে মাধ্যমটি (রেডিয়ো) ১০০ বছরের পুরোনো। আসলে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে ভারতবাসী এক আবেগপূর্ণ সংযোগ তৈরি হয়েছে।' আমেরিকার বসবাসকারী ভারতীয়রা প্রায়

২০০টি স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের উদ্যোগেও এই অনুষ্ঠান শুনেছেন। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত একটি এফএম রেডিয়ো চ্যানেলও প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত'-এর রেকর্ড করা অনুষ্ঠানটি পরে প্রচার করে।

নিউ ইয়র্কে অবস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরের অছি পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্প্রচারিত হয়। নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয়রা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান। নিউজিল্যান্ডের একটি জায়গায় ১০০ জন ভারতীয় মহিলা একত্র হয়ে শুনেছেন শততম 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান। এঁদের মধ্যে ছিলেন ১০০ বছর উত্তীর্ণ রামী বেন। অনুষ্ঠান শেষে রামী বেন-কে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর ছবির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে। ব্রিটেনের লন্ডনে অবস্থিত ইন্ডিয়া হাউসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' শেষ হয়। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেন গ্রেটব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। এ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রচারিত হয় 'মন কী বাত'। প্রচুর মানুষ এই অনুষ্ঠান শোনেন, বহু জায়গাতে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা একত্র হয়ে নিজেদের উদ্যোগেই এই অনুষ্ঠান শুনেছেন।

ভারতে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা যে অকাশছোঁয়া তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের এক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে হয়। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েরাবের নেতৃত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রয়োগ করলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে রয়েছে জনমোহিনী নেতৃত্বের এক বিরল গুণ। এই ধরনের নেতৃত্বের ওপর মানুষ ভরসা রাখে, বিশ্বাস করে। পৃথিবীর সর্বত্র জনমোহিনী নেতৃত্ব আর সেভাবে উঠে আসছে না। কিন্তু এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ক্ষমতার গজদন্তমিনারে আটকে রাখেননি। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নানা পন্থা খুঁজে নিয়েছেন। এরকম একটি অনুষ্ঠান হলো 'মন কী বাত'। যারা ভারত ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন ভাগ্য গড়তে তাঁরা ভারতের সঙ্গে সহযোগ রাখতে চান। তাঁরা এক শক্তিশালী ভারতকে দেখতে চান। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের অধিকাংশই বিদেশে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল। যে দেশ থেকে তাঁরা বাইরে গেছেন সেই দেশ যদি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে তবে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা কর্মক্ষেত্রে বা বিদেশের অন্য সব ক্ষেত্রে সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারেন। মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী দেশ। মোদীর অভ্যন্তরীণ বা বিদেশ নীতি আজ বিশ্বে অধিকাংশ মানুষের আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁদের বক্তব্যে মোদীকে উদ্ধৃতি দেন, এক উন্নয়নশীল দেশের তকমা ছাড়িয়ে ভারত আজ বিশ্বে এক উন্নত দেশের মর্যাদা পাচ্ছে। ব্রিটেনকে সরিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উঠে এসেছে। পরমাণু শক্তিধর ভারত আজ সামরিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের সপ্তমস্থান আদায় করে নিয়েছে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের মাতৃভূমির যোগসূত্র দৃঢ় করতে উদ্যোগী হন। মোদীর কাছে প্রবাসী ভারতীয়রা কেবল ভারতের 'সফট্ পাওয়ার'-এর অংশ নয়, তারা ভারতের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। World Bank-এর Migration and Develpment Briaf যা ২০২২ সালে প্রকাশিত হয় সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রতি বছরে প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠানো অর্থ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁয়েছে। ২০২২ সালের World Migration Report অনুযায়ী ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রবাসী মানুষ ভারত থেকেই গেছেন। এই বিরাট অংশকে ভারতের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে বাঁধতে প্রধানমন্ত্রী Diaspora Diplomacy-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন সেখানে প্রবাসীরা তাঁদের নিজের দেশের সঙ্গে নতুন দেশের সেতু বন্ধনের কাজ করবেন। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ করে যে বিদেশে কর্মরত ভারতীয়রা মোদীর ভাবনাকে গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে অমেরিার টেক্সাসে 'হাউডি মোদী' অনুষ্ঠানের বিপুল সাফল্য মোদীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিতবাহী। টেক্সাস ইন্ডিয়া ফোরাম ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাতে ৫০০০০ মানুষ যোগ দেন। একমাত্র পোপ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশি নেতার অনুষ্ঠানে এতো মানুষ আমেরিকার কোথাও উপস্থিত হননি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের 'রাষ্ট্রের দূত' বলে উল্লেখ করেন। ২০২২ সালের জুন মাসে জার্মানি প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলনে মোদী বলেন, 'বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা কেবল ভারতের সাফল্যের প্রতীক নন, তাঁরা ভারতের ব্রান্ড অ্যামবাসাডর'। মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের দেশের কূটনৈতিক শক্তি বা displomatic force-এ পরিণত করতে চেয়েছেন এবং সেকাজে তিনি সফলও হয়েছেন। ভারতের 'সফট্ পাওয়ার' (short power)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সাংস্কৃতিক কূটনীতি বা cultural diplomacy। এরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হসেবে diaspora diplomacy-কে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

তাই বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা যাঁরা এখনো মনেপ্রাণে ভারতীয় তাঁদের কাছে বিপুল জনপ্রিয় হলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাঁর নেতৃত্বে ভারত যে সাফল্যের সোপান বেয়ে ওপরে উঠছে প্রবাসীরাও নিজেদের সেই সাফল্যের শক্তির বলে মনে করেন। এই প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মনের মতো তাই তাঁর 'মন কী বাত' বা মনের কথা প্রবাসীদেরও হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। ■

ফঃ ৪

বসুন্ধরা দিবসে ভূ-অলংকরণে সংস্কার ভারতীর ধরিত্রী বন্দনা

পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়নের প্রবল প্রভাব এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্বিচারে গাছ কাটা ও প্লাস্টিক দূষণের প্রভাবে জেরবার মানুষ। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতির জলবায়ু, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর। তাই পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে সারা বছর নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় প্রকৃতি রক্ষার্থে। তারই একটি বিশেষ পরিকল্পনায় প্রতি বছরের মতো গত ২২ এপ্রিল, বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে জেলায় জেলায় এক অভিনব আঙ্গিকে থিম 'বিনিয়োগ করুন ধরিত্রীর বুকে' এই সংকল্পে ধরিত্রী বন্দনায় ব্রতী হন শিল্পীরা।

এই দিনের অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ, শোভাযাত্রা সহযোগে ধরিত্রী বন্দনা, ভূ-অলংকরণ, পুষ্প আলপনা, রঙ্গোলি ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বসুন্ধরাকে পূজন ও আবাহন করা হয়। ক্রমাগত কার্বন নিঃসরণে জল, মাটি, বায়ু মণ্ডলকে করছে কলুষিত। রোগ ব্যাধিতে জর্জরিত মানব জীবন। এই ধরিত্রীকে রক্ষায় কার্বন নিঃসরণ কমানো, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে মানুষকে সচেতন হতে হবে। তার প্রতিবিধানেই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার এই সংকল্পে যুক্ত সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলার স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা দল বেঁধে কেউ ফুল দিয়ে আলপনা করতে করতে বললেন আমরা চাই আমাদের বাসস্থান দূষণ মুক্ত হোক। কলেজ ছাত্রী সপ্তরী চট্টোপাধ্যায়, সপ্তিকা ঘোষ বলেন, 'আমরা চাই পৃথিবী প্লাস্টিক মুক্ত হোক। তার শপথ নিতে আমরা একজোট হয়েছি, আজ থেকে সংকল্প নিলাম প্লাস্টিক ব্যবহার করব না।' সবুজায়নের লক্ষ্যে ধরিত্রী, বসুন্ধরাকে সাজানো হয় ফুল ও রঙ্গোলির মাধ্যমে। শাখার শিল্পীরা ধরিত্রীর বুকে এঁকে দেয় পুষ্প আলপনা। নানান সাজে সাজিয়ে তোলা হয় অনুষ্ঠান অঙ্গন। অনুষ্ঠিত হয় বৃন্দগান কথা ও কবিতা। শহরের ১০টি নৃত্যদল প্রকৃতি পর্যায়ের গানে নৃত্য পরিবেশন করে।

এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল পাল, দীনবন্ধু বিশ্বাস, নারায়ণ ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য বিশ্বাস। দর্শকাসনে শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গুণীজনেরা উপস্থিত থেকে

অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট ১০ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। সংস্কার ভারতী দক্ষিণ কলকাতা জেলা সমিতির অন্তর্গত বেহালা চর্চা কেন্দ্র ২২ এপ্রিল বসুন্ধরা দিবস বেহালার বিখ্যাত 'সাবর্ণ রায়চৌধুরী' পরিবারের রাধাকান্তদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে বসুন্ধরা দিবস পালনে মুনশিয়ানার পরিচয় রাখে। বৌদ্ধিক, দেশাত্মবোধক ও প্রকৃতি পর্যায়ের সংগীত চলাকালীন ভূ-অলংকরণ এবং বৃক্ষ প্রদানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন।

এই দিন সংস্কার ভারতীর উত্তর কলকাতা জেলা সমিতি (দেশবন্ধু নগর, দক্ষিণেশ্বর, বাগুইহাটি, উত্তর কলকাতা চর্চাকেন্দ্র) বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষ্যে সাহাপাড়া মন্দির প্রাঙ্গণে ধরিত্রী বন্দনা অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। সমবেত ভাবসংগীত ও দীপমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক চঞ্চল কুমার ঘোষ বসুন্ধরা দিবসের তাৎপর্য এবং বৈদিকযুগে তার সূচনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আলোচনা করেন। ভূ-অলংকরণ, সমবেত মাতৃবন্দনা-সহ, মঙ্গলঘট এবং বরণডালা সহযোগে পথ পরিক্রমা ও পরবর্তীতে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন পারিপার্শ্বিক মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

বাঁশদ্রোণী চর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা সন্তোষী মাতার নাটমন্দিরে আয়োজন করে এক অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিক বসুন্ধরা বন্দনা। 'সাধয়াতি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম্' মিলিত কণ্ঠে উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। ফুল, লতাপাতার আলপনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গাছগাছালির ভেষজ গুণাগুণ লিখে সাজানো হয় মন্দির প্রাঙ্গণ। ভূক্ষয় রোধ এবং ভূরক্ষা সংরক্ষণের ওপর বৌদ্ধিক প্রদান ও বসুন্ধরা বন্দনা, শিশুকণ্ঠে আবৃত্তি ও প্রকৃতি পর্যায়ের সংগীতের মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন বসুন্ধরা দিবস। সকলে মিলে ধরিত্রী মাকে রক্ষা করার পবিত্র শপথবাক্য পাঠ করে অঙ্গীকারবদ্ধের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপন হয়।

ধবিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শাখার অনবদ্য নান্দনিক ভূ-অলংকরণ বিশেষ নজর কাড়ে। এছাড়া তাঁরা বৃক্ষরোপণ ও ধরিত্রী বন্দনার মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এই দিনটি। সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা চর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে জামদানির শিবমন্দির প্রাঙ্গণে নিম চারা রোপণ, ভাবসংগীত, নাচ, গান, কবিতার মাধ্যমে বসুন্ধরা দিবস পালন করে। শেষে শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এছাড়া, ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ কলকাতা চর্চাকেন্দ্র, ঢাকুরিয়া চর্চাকেন্দ্র, মেদিনীপুর জেলা সমিতি এবং হুগলী জেলার ব্যান্ডেল চর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা যথাক্রমে কসবা নিউ মার্কেট কালী মন্দির প্রাঙ্গণে, লেক অ্যাভিনিউ নকুলেশ্বর মন্দির অঙ্গনে, ধরমপুর কালী মন্দির প্রাঙ্গণেও মহাতাব কালীমন্দির চত্বরে সমবেত ভাবে আলপনা, পূজা-পাঠ, বসুধারায় জল প্রদান ও দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিত্রী দিবস পালন করেন। হাওড়া নগর কেন্দ্র, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা চর্চাকেন্দ্র, আমতা, হাওড়া জেলা চর্চাকেন্দ্র ও উত্তরপাড়া চর্চাকেন্দ্র যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি পালন করে।

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ

গত ২ মে সন্ধ্যা ৭টায় উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ (সাধারণ)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৌশিক ভট্টাচার্য মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন। কৌশিকবাবু মূলত ব্যবসায়ী হলেও 'মুক্তির কাণ্ডারী' নামক এনজিও-র কর্ণধার হিসেবে রায়গঞ্জে বিশেষ ভাবে পরিচিত। সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী বর্গ পরিচালনার দায়িত্ব ঘোষণা করেন।

বর্গাধিকারী : রবিকান্ত বর্মণ, কার্যবাহ : চন্দন কুণ্ডু, পালক অধিকারী : তরুণ কুমার পণ্ডিত, মুখ্যশিক্ষক : নবারুণ ঘোষ, সহ-মুখ্যশিক্ষক : দীপঙ্কর পালিত, বৌদ্ধিক প্রমুখ : প্রভাত চন্দ্র পাত্র, সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ : সনাতন শীল, সেবা প্রমুখ : পঙ্কজ বিশ্বাস, সর্বব্যবস্থা প্রমুখ : সুমন দত্ত, সহ-সর্বব্যবস্থা প্রমুখ : সন্দীপ সামন্ত।

বর্গে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি জানান, এই সময়ে এরকম বর্গ পশ্চিমবঙ্গে ৫টি সহ সারা ভারতবর্ষে ১০৮টি স্থানে চলবে। তিনি উল্লেখ করেন পুরো সমাজ মনে করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতবর্ষকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে নিয়ে যেতে পারে। তাই বর্গের সকল শিক্ষার্থীকে শরীর, মন, বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ ভাবে এই বর্গে সমর্পণ করার প্রেরণা দেন। অনুশাসন ও সমরসতার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ ভাবে সজাগ থাকতে বলেন।

বর্গে অংশগ্রহণকারী ১৫৪ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিতির মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এই বর্গে ১২টি নগর এবং ৪২টি খণ্ড থেকে মোট ১৫৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। শতাধিক ছাত্র ছাড়াও কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, শিক্ষক, গবেষক, আচার্য, শ্রমজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণ নেবার উদ্দেশ্যে এই বর্গে যোগদান করেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষেদের সমরসতা কেন্দ্রীয় টোলি বৈঠক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় টোলির ত্রৈমাসিক বৈঠক সম্পন্ন হলো ড. ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মস্থল মহু শহরে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২ দিনের কেন্দ্রীয় টোলি বৈঠক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যাধ্যক্ষ ও সমরসতার পালক অধিকারী আলোক কুমারজী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমরসতা প্রমুখ দেওজী ভাই, সহ-প্রমুখ রাজেশজী। বৈষম্য দূর করে একরস সমাজ নির্মাণের কাজে গতি প্রদান করার যে কাজ চলেছে, তার সঙ্গে সমাজে যে সব বিরোধী ন্যারেটিভ চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে

সঠিক বিষয় সামনে এনে বিভ্রান্তি দূর করার কাজ শুরু হচ্ছে। সমরসতার ভাবনা হৃদয়ে অনুভব করার জন্য ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মস্থলী তথা তার অস্থি কলস স্থাপনের জায়গা দর্শন করা হয়। বৈঠক শেষে ভগবান পরশুরামের জন্মস্থান জানাপাও দর্শন ও ভগবান শিবের পূজাভিষেক করা হয়। পরে পাতালপানিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁতিয়া ভিল মন্দির দর্শন।

সমস্ত দর্শন সমরসতা কেন্দ্রিক ছিল। শেষে নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে কলকাতা ক্ষেত্র সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার-সহ ৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর মালদা সমরসতা মঞ্চের উদ্যোগে নিঃশুল্ক পঠন সামগ্রী দান

গত ৩০ এপ্রিল উত্তর মালদা সমরসতা মঞ্চের পক্ষ থেকে শুভঙ্কর রবিদাস ও ছোটু রবিদাসকে সমস্ত রকম পড়াশোনা সামগ্রী প্রদান করা হয় চাঁচল সঙ্ঘ কার্যালয়ে। এদের পড়াশোনার সামগ্রী আজীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্থানীয় বাসিন্দা স্বর্ণাভ সরকার। চাঁচল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে এদের নিঃশুল্ক পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সমরসতা প্রমুখ দীলিপ ভগত, গ্রাম বিকাশ প্রান্ত টোলি সদস্য জয়দেব দাস, জেলা প্রচারক সুধীর চন্দ্র মণ্ডল, জেলা সমরসতা সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলার সমরসতা টোলির সদস্যরা।

কলকাতা বিধাননগরে চিন্ময় মিশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ২০ এপ্রিল কলকাতায় বিধাননগরে হায়াত রিজেন্সি হোটেলের কনফারেন্স হলে চিন্ময় মিশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল জি-২০'র থিম 'বসুধৈব কুটম্বকম্'। উপস্থিত ছিলেন চেন্নাই চিন্ময় মিশনের স্বামী মিত্রানন্দ, ব্যাঙ্গালুরু যোগোদ্যানের স্বামী যোগানন্দ, বিজ্ঞানী ড. পার্থ ঘোষ,চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বসুধৈব কুটুম্বকম আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, চলচ্চিত্র ও মনোরঞ্জন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ওপর বিভিন্ন বক্তা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তারা জানান, সারা ভারতে এই ধরনের ছয়টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের আলোচনা সভা

গত ২৮ এপ্রিল নাগেরজলা ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিকদের বারো দফা দাবি নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জেলা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি তাপস দাস । উত্তর পূর্ব ভারতের পরিবহণ প্রভারী উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তিন শতাধিক ইলেকট্রিক রিকশা চালক উপস্থিত ছিলেন। ওই দিনই ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনালে ত্রিপুরা ট্রাক ডাইভার মজদুর সঙ্ঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩১ সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আসন্ন সম্মেলনের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট রাম সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অরুণাভ দত্ত ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের সেক্রেটারি বক্তব্য রাখেন।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা চক্র

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'ভারতীয় শিলালিপি' বিষয়ে বিশেষ আলোচনা চক্র, যা গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল দু দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের মুখ্য অতিথি ও মুখ্য বক্তা ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপক পার্থপ্রতিম দাস। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিভাগীয় অধ্যাপক বৃন্দ, বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং গবেষক হতে শুরু করে বিভাগীয় বিদ্যার্থীরা। অধ্যাপক পিপি দাস, শিলালিপি বা অভিলেখ কী এবং ইতিহাসের উপাদান হিসেবে শিলালিপির গুরুত্ব বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবগাথা তুলে ধরেন। সম্রাট অশোকের শিলালিপি, দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি, কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতি গুম্ফা শিলালিপি, মিহির ভোজের গোয়ালিয়র শিলালিপি হতে শুরু করে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের অভিলেখ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক চন্দন ভট্টাচার্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক অনিন্দ্য চৌধুরী।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও তার উদ্যান

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ তথা লোকহিতৈষণার উজ্জ্বল নক্ষত্র লোকমাতা রানি রাসমণি ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতার জানবাজার নিবাসী এই কালী উপাসক ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মনস্থ করেন সদলবলে নৌকাযোগে হিন্দুতীর্থ কাশীধামে যাবেন। তীর্থযাত্রার ঠিক একদিন আগে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি; দেবী অন্নপূর্ণা তাকে বলছেন, 'কাশী যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, গঙ্গার তীরে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে সেখানে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো কর। এখানে সেই মূর্তিতেই আমি প্রকট হয়ে সেই পুজো গ্রহণ করবো।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, রাসমণি ছিলেন শ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। তাঁর আবির্ভাব ধরাধামে জগদম্বার পূজা-প্রশস্তির জন্য।

রানির কাশীযাত্রা বাতিল হলো, তিনি অনতিবিলম্বে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে 'সাহেবন বাগিচা' রূপে পরিচিত জন হেস্টি নামক এক সাহেবের মালিকানায় থাকা ২০ একরের এক ভূমিখণ্ড ক্রয় করলেন। দক্ষিণেশ্বর তখন এক গণ্ডগ্রাম; আশেপাশে কিছুটা জঙ্গল, কলকাতার জনগণ সে গ্রামটি তেমনভাবে চিনতেনও না। কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এই জমিটির সঙ্গে ছিল খ্রিস্টান কুঠিবাড়ি আর গাজিপিরের তলা; ছিল মুসলমানদের কবরডাঙ্গা, কয়েকটি পুকুর, আমবাগান; পাশেই প্রবাহিত পতিতপাবনী গঙ্গা। তান্ত্রিক মতানুযায়ী এই অঞ্চলটি শক্তিপীঠ হিসেবে গড়ে তোলার উপযুক্ত বিবেচিত হলো এবং এখানেই নির্মিত হলো ধর্মসমন্বয়ের পুণ্যক্ষেত্র শ্যাম-শ্যামা-শঙ্করের মন্দির। মোট সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি কুঠিবাড়ি সমেত রানি কিনলেন ৪২ হাজার ৫০০ টাকায়। ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'বিল অব সেল'-এর মাধ্যমে তা কেনা হলো, কারণ তখনও জমির রেজিস্ট্রেশন আইন চালু ছিল না। পরে কুঠিবাড়িটি কিছুটা সংস্কার করে তাকে বাসোপযোগী করা হয়েছিল। ১৮৬১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যুর একদিন আগে রানি দেবোত্তর দলিল করে গেলেন। মৃত্যুর প্রায় ৬ মাস বাদে ১৮৬১ সালের ২৭ আগস্ট আলিপুরের রেজিস্ট্রি অফিসে তা আনুষ্ঠানিক নিবন্ধীকৃত হয়।

যে জমি রানি কিনলেন তার উত্তরে ছিল সরকারি বারুদখানা, পূর্বে কাশীনাথ চৌধুরীদের জমি, দক্ষিণে জেমস হেস্টির কারখানা ও পরবর্তীকালে যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাড়ি এবং পশ্চিমে গঙ্গা। মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু

হয়ে গেল ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। রানি ঠিকাদারি সংস্থা ম্যাকিনটস অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে পোস্তা ও ঘাট তৈরির বরাত দেন; তা নিপুণভাবে সম্পন্ন হলে তাদেরকেই মন্দির নির্মাণ-কাজটির বরাত দেন এবং তারাই প্রস্তুত করে মন্দিরের নকশা। কোম্পানি ধীরে ধীরে রাধাকান্ত, ভবতারিণী, বারো শিবের মন্দির এবং নাটমন্দির ছাড়াও গড়ে তোলে দুটি নহবতখানা, চাঁদনি, বিস্তৃত পাকা চকমিলান উঠান, উঠানের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে নানান কাজে ব্যবহারযোগ্য একতলা ঘরের সারি, ভেতরের পুকুরগুলির ঘাট এবং চারপাশের বিস্তৃত প্রাচীর। সমুদয় কাজ শেষ হতে প্রায় আট বছর সময় লেগেছিল; মোট খরচ হয়েছিল আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা।

(২)

বড়ো সংসারের ব্যয়ভার চালানোর জন্য ১৮৪৯-৫০ সাল নাগাদ মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরকে কামারপুকুর গ্রামের সংসারের দায়িত্ব দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৫ বছর বয়সে কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে এসে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুলে বসলেন। প্রায় তিন বছর পরিশ্রম করে টোলের প্রচার-প্রসারও করলেন; কিন্তু তবুও টোল থেকে আয় তেমন না হওয়ায়, রামকুমারকে ঝামাপুকুর পল্লীতে কয়েকটি বাড়িতে দৈনন্দিন দেবসেবার কাজ বা যজমানি করতে হলো। ১৮৫২-৫৩ সাল নাগাদ রামকুমার তার ১৭ বছরের ভাই গদাধরকে কলকাতায় আনলেন। তারা প্রথমে কিছুদিন শ্যামপুকুরে নাথের বাগানে উঠলেন, পরে উঠে এলেন ঝামাপুকুরে। আনুমানিক ১৮৫২-৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫-৫৬ সালের মধ্যে গদাধর (পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ) বড়দার সঙ্গে বাস করেছিলেন ঝামাপুকুরে। এই সময়ের মধ্যে তিনি দিগম্বর মিত্রের রাজবাড়িতে 'শ্রীধর' নামের নারায়ণ শিলার নিত্যপূজা করেছেন।

এদিকে রানি রাসমণি কৈবর্তবংশীয় হওয়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী ও রাধাকান্ত মন্দিরে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা পূজা করতে অসম্মতি জানালে গদাধরের দাদা রামকুমার সেই পূজাকে স্বীকৃতি দিয়ে কর্মগ্রহণ করলেন। যুবক গদাধর প্রথমে তা মেনে নেননি, পরে দাদার ক্রমাগত প্রচেষ্টায় গদাধরের চিন্তার পরিবর্তন ঘটল এবং তিনি প্রথমে রাধাকান্ত ও পরে শক্তিসাধনায় দীক্ষিত হয়ে (দীক্ষাগুরু প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য) ভবতারিণী মন্দিরের পূজকের পদ গ্রহণ করলেন। শূদ্রের মন্দিরে ব্রাহ্মণ গদাধর চট্টোপাধ্যায়— এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

(৩)

১৮৫৫ থেকে ১৮৮৫ এই ৩০ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করেছেন, যদিও মাঝে কিছু সময় তিনি কাটিয়েছেন কামারপুকুরে। এর প্রতিটি আনাচেকানাচে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদস্পর্শ; স্নান করেছেন পাশ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গানদীর চাঁদনী ঘাটে। গঙ্গানদীতে নৌকা ভাসিয়ে এলে দক্ষিণেশ্বরের এই পবিত্র ঘাটের সোপান পেরিয়ে পূর্বমুখে কালীবাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। সেই বিস্তীর্ণ সোপানের পর চাঁদনী, তখন সেখানে থাকতেন মন্দিরের চৌকিদারেরা। পুণ্যস্নানের আশায় এখানেই লোকজন জড়ো হতেন, অপেক্ষমান থাকতেন মন্দিরের পুণ্যার্থী ও অতিথিগণ। এই চাঁদনীটি দ্বাদশ শিব মন্দিরকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উত্তরের ছয়টি শিব মন্দির যথাক্রমে যোগেশ্বর, রত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নাগেশ্বর এবং নির্জরেশ্বর। দক্ষিণের ছয়টি মন্দির হলো যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাদেশ্বর, নন্দীশ্বর এবং নরেশ্বর। শিবরাত্রি, নীলের পুজো, চড়ক পুজো ছাড়াও মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন অর্থাৎ স্নানযাত্রার দিন শিবমন্দিরগুলিতে বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়।

পশ্চিমের এই শিব মন্দির ও চাঁদনীর পূর্বে বিস্তীর্ণ পাকা চকমিলান উঠোন, তা ইষ্টক নির্মিত; উঠোনের উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর যথাক্রমে বিষ্ণুমন্দির বা রাধাকান্তের মন্দির, ভবতারিণী কালী মায়ের মন্দির, নাটমন্দির এবং বলিদান ক্ষেত্র। উঠোনের তিনপাশে একতলা ঘরের সারি, যাকে বলা হয় 'দালান বাড়ি'— তা নানান কাজে ব্যবহৃত; কোনোটি ভাড়ার ঘর, কোনোটি রান্নাঘর, কোনোটি আবার নৈবেদ্যের ঘর কিংবা ভোগের জন্য বরাদ্দ ঘর, অতিথিশালা, সেই সময়ের দপ্তরখানা বা খাজাঞ্চি-ঘর।

বিষ্ণু মন্দিরের ঘর ও তাতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পশ্চিমাস্য। মন্দিরে উঠতে সিঁড়ি, সামনে দালান এবং মন্দিরতল প্রস্তর-নির্মিত। কালী মন্দিরের পূজারি হবার আগে গদাধর চট্টোপাধ্যায় প্রথমে এই মন্দিরে পূজারির কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সালে (১২৬২ বঙ্গাব্দ)-র ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবে শয়ন দেবার সময় এই মন্দিরের পূর্ববর্তী পুরোহিতের হাত থেকে পড়ে মূর্তির পা ভেঙে যায়, ব্রাহ্মণ গদাধর তখন ঐতিহাসিক বিধান দেন, রানির জামাইয়ের পা ভেঙে গেলে যেমন তাকে অচল বলে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হবে না, বরং যথাবিহিত

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে তাকে সুস্থ করে তোলা হবে, ঠিক তেমনই বিগ্রহের সামান্য একটি অঙ্গ ভেঙে গেলেও তাকে বাতিল করে গঙ্গায় বিসর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেই বিগ্রহের ভঙ্গুর অংশ নিখুঁত ভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সেই মূর্তিই দীর্ঘদিন ধরে সেখানে পুজো হয়ে আসছিল।

ভবতারিণী মন্দিরটি বাধাকান্ত মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত, মন্দিরে উচ্চবেদী সোপান এবং মন্দির তল শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত। শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)-র বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা যাক, 'বেদির উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক— উপর দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেত প্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃত, এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময় মূর্তি। মন্দিরের মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা— মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। বেদির উপর পদ্মাসনে রুপোর গ্লাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটী, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্মিত সিংহ পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদির অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদি উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা।'

মায়ের ঘর

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর

দ্বাদশ শিব মন্দিরের একেবারে উত্তরে এবং চকমিলান উঠোনের উত্তর প্রান্তের ঘরগুলির একেবারে পশ্চিমের কোণের ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষের দিকে ১৪ বছর (১৮৭১-১৮৮৫, তারপর কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন, ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট তাঁর শরীর যায়) অতিবাহিত করেছিলেন। যদিও তার আগে তিনি থাকতেন কুঠিবাড়ির পশ্চিমের একটি ঘরে, যে ঘর দিয়ে সোজাসুজি বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায়। কুঠিবাড়িতে তিনি অবস্থান করেছেন ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৭০ বা ৭১ সাল পর্যন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অবস্থানের ঘরটির পশ্চিমদিকে একটি অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, যেখান দিয়ে পশ্চিমাস্য হয়ে গঙ্গা-দর্শন করা যায়। এই বারান্দা থেকে নেমে এলেই উদ্যানপথ, তারপর পুষ্পোদ্যান, তারও পরে পোস্তা এবং গঙ্গা। ঘরের ঠিক উত্তরে চারকোণা বারান্দা, বারান্দা থেকে নেমে এলে উদ্যানপথ এবং পুনরায় পুষ্পোদ্যান। ১৮৭২ সালের ৫ জুন ফলহারিণী কালীপূজার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘরেই স্ত্রী সারদাদেবী-কে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা করেছিলেন।

মা সারদাদেবীর ঘর বা নহবতখানা

মন্দির চত্বরে তৈরি হয়েছিল দুটি নহবতখানা; একটি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তরে পথ ও উদ্যান পেরিয়ে এবং অপরটি মন্দির জমির একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। দুটিই গঙ্গার প্রায় কাছাকাছি। নহবত থেকে দেবীর উদ্দেশ্যে ছয় দফায় বেজে উঠত রাগরাগিণী— প্রথমটি প্রভাতে মঙ্গলারতির সময়, দ্বিতীয়টি বেলা ন'টার সময় পূজার প্রারম্ভে, তৃতীয়টি দ্বি-প্রহরে ভোগারতির পর যখন দেবীকে বিশ্রামে পাঠানো হতো, চতুর্থটি বেলা চারটেয় যখন দেবী বিশ্রামান্তে উঠেছেন এবং মুখ ধোবেন এমন বিবেচনা করা হতো, পঞ্চমটি

সন্ধ্যারতির সময় এবং ষষ্ঠ বা শেষ নহবত বাজত রাত ন'টার সময় যখন দেবীকে শীতলের পর শয়ন দেওয়া হতো।

উত্তরের নবহতখানা যার অবস্থান শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের ঠিক উত্তরে, সেইখানেই নীচের তলার একটি অপরিসর ঘরে থাকতেন মা সারদা (১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে মা সারদা এখানে অবস্থান করেছিলেন)। ঘরটির মাপ একেবারেই ছোটো, অষ্টভুজ, একক দক্ষিণ-দুয়ারি, ঘরের ক্ষেত্রফল প্রায় ৫০ বর্গফুট (দেওয়ালের মধ্যে সর্বাধিক দূরত্ব ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি); দরজার পরিমাপ ৪ ফুট ২ ইঞ্চি × ২ ফুট ২ ইঞ্চি। এই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা চন্দ্রামণী দেবীও থাকতেন, ১৮৭৭ সালে তার মৃত্যু হয়। নহবতে সারদা মায়ের সঙ্গে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝিও।

পঞ্চবটী

নহবতের পরেই বকুলতলা এবং বকুলতলার ঘাট। এই বকুলতলার কিছুটা উত্তরে বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বেল— এই পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষের সম্মিলনে গঠিত পঞ্চবটী । পুরাতন একটি বট আর অশ্বত্থ গাছ ছিলই, তাতে অসংখ্য কোটর-বিশিষ্ট এবং পাখি ও নানান জীবজন্তুর বাসা; আর এই বৃক্ষ-যুগ্মকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ বাকি গাছ রোপণ করলেন আর তার গোড়ায় বৃন্দাবনের রজঃ এবং রাধা ও শ্যামকুণ্ড থেকে মাটি এনে ছড়িয়ে দিলেন; পবিত্র বৃক্ষ-পঞ্চমের পূর্বদিকে নির্মাণ করালেন ঈশ্বর-সাধনা ও চিন্তনের জন্য একটি পবিত্র-কুটির। পঞ্চবটীর অনতিদূরে শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসন। বর্তমানে সেই কুটিরের সংস্কারসাধন করে তৈরি হয়েছে শান্তি-কুটির। পঞ্চবটীর পবিত্র ভূমিখণ্ডে তাঁর অনন্য সাধনা, নিশিযাপন, পরে ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হয়ে তাতে অমল পদাচারণা—ভক্তবৃন্দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে।

গাজিতলা

মন্দিরের পূর্বদিকে যে পুকুর যাকে বলা হতো 'গাজিপুকুর', যেখানে রয়েছে মন্দিরের বাসন-মাজার ঘাট, তারই ঈশানকোণে এবং মন্দির চত্বরের সদর ফটক পেরিয়ে পশ্চিমাস্য পথে মন্দির দেউড়ির কিছু আগে বাম পাশে পুরনো অশ্বত্থ-বটের তলায় পির গাজিসাহেবের আস্তানা ছিল। জমি কেনার পর রাসমণি স্বপ্ন দেখলেন, গাজি সাহেব বলছেন, 'আপনি আমার স্থান বাঁধাইয়া দিন, সন্ধ্যাবাতি দিন, দুগ্ধ-সিরনি দিন, মাগো লক্ষ্মীরূপিনী শক্তি, দেবী মা, আমি মুসলমানের গাজিপির আর হিন্দুরও গাজিপির, মাগো আমার কাছে জাত নাই, হিন্দু-মুসলমান নাই, সকলেই সমান। মা, আমার আশীর্বাদে শীঘ্র দেবতাদিগেরও দর্শন পাইবেন। আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা পূর্ণ হইবে।' রানি স্বপ্ন-বাণী অন্যথা করলেন না; গাজিবাবার বট-অশ্বত্থের গোড়া বাঁধালেন, নিয়োগ করলেন মুসলমান সেবাইত— তার মাইনে, সিধা ও অন্যান্য ও বেলতলার উত্তর সীমায় মন্দির-প্রাচীর, তার উত্তরে সরকারি বারুদঘর।

হাঁসপুকুর

পঞ্চবটীর পূর্বপ্রান্তে ছিল এক পুকুর, যা 'হাসপুকুর' নামে পরিচিত ছিল। মন্দির চত্বরে অবস্থিত ছিল আস্তাবল ও গোশালা, এদেরই দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ছিল এই হাঁসপুকুর। আর এই গোশালার পূর্বদিকে ছিল খিড়কির দুয়ারের ফটক, যে পথ দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের গাঁয়ের মানুষ মন্দিরে আসতেন আর মন্দির কর্মচারীদের পরিবার গ্রামে যেতেন। গাজিতলা থেকে গোশালার মধ্যে মন্দিরের কুঠিবাড়ি ও হাঁসপুকুরের পূর্বভাগে ছিল এক নান্দনিক কুসুমোদ্যান, ফল-বাগিচা এবং আরও একটি পুকুর।

(৪)

দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে ছিল নানান ফুলের সৌকর্য, নহবতের প্রভাতী রাগের মূর্চ্ছনায় শুরু হতো পুষ্পচয়নের কাজ। শ্রীম-র বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচি ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচি ফুল শ্রীরাম বড়ো ভালোবাসেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকোজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা— নিকটে জুঁই কোথাও-বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোপাল, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প— মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী— উচ্চ ইষ্টক নির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণ দিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশেপাশে বেল, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।' □

জেনেভা চুক্তি, ১৯৫০

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড একটা নির্ভেজাল মিথ্যা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

১৯৬৫ থেকে ৭৫ আমাদের ছাত্রজীবন কেটেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে। এখানকার কমিউনিস্টরা আকাশপাতাল কাঁপাত 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম', 'ভুলতে পারি বাপের নাম, ভুলতে পারি মায়ের নাম, ভুলতে পারি না ভিয়েতনাম'। ১৯৭১-এ পাশের দেশ পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৯০ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালিকে যখন নৃশংস হত্যা করা হচ্ছিল তখন এদের মুখে ছিল পাথুরে নীরবতা।

আমাদের বোঝানো হয়েছিল যে ভিয়েতনাম একটা আদ্যন্ত কমিউনিস্ট দেশ এবং তার অবিসংবাদিত নেতা হো চি মিন একজন নির্ভেজাল কমিউনিস্ট। আমরা সেই উত্তেজনার আগুনে গা সেঁকতাম। বছর গড়াল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হলো। কিন্তু কী দেখলাম বা দেখেছি আমরা? কোথায় কমিউনিজম? আমাদের এও বোঝানো হয়েছিল যে কমিউনিস্টদের কোনো দেশ, জাতি, রাষ্ট্র হয় না; মানে জাতীয়তাবাদ বলে কিছু হয় না, হয় আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বা ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড। পৃথিবীতে, কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো দেশের কোনো সীমানা হয় না। দুটো কমিউনিস্ট দেশ একে অপরকে কখনো আক্রমণ বা জমি দখল করবে না। একেই বলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড। তার কিছুদিন পরেই আমরা দেখলাম কমিউনিস্ট দেশ রুশ-চীন যুদ্ধ, ভিয়েতনাম-চীন যুদ্ধ। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক পরে আমাদের সময় এসেছে কার্যক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড কতটা রূপায়ণ করা সম্ভব হয়েছে তা ফিরে দেখার।

হো চি মিনের কার্যকলাপ : হো চি মিনের জীবনীকার অ্যান্ডেন হুইটম্যান বলেছেন, 'হো চি মিন দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন এবং সফলভাবে কমিউনিজমকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিলিত করেছিলেন। এই দুইয়ের জন্যই বিংশ শতকের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন'।

তিনি তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। তাঁর বাবা এলাকার ধান চাষিদের তুলনায় একটু ভালো ছিলেন, কিন্তু তিনি দৃশ্যত দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রবল জাতীয়তাবাদী, তিনি তাঁর দেশের দখলদারের ভাষা ফরাসি শিখতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ফরাসি বিরোধী গোপন সমাজে যোগদান করেছিলেন। তরুণ

সেনাবাহিনীর সঙ্গে হো-চি-মিন

ফঃ৫

হো ফরাসি বিরোধী নেটওয়ার্কে তাঁর পিতার বার্তাবাহক হিসেবে প্রথম গোপন আন্দোলন জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শীঘ্রই তাঁর বাবা সরকারি চাকরি খোয়ান এবং দেশজ ওষুধ দিয়ে মানুষের চিকিৎসা করতে থাকেন।

ঔপনিবেশিক সমস্যা সমাধানে ভার্সাই সম্মেলনের ব্যর্থতায় ফরাসিদের হাত থেকে ভিয়েতনামের মুক্তির জন্য হো-র সব আশা ফুরিয়ে যায়। তাঁর বিশ্বাস জন্মালো যে এখন সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপাতে হবে। বস্তুত তাঁর প্রথম রেকর্ড করা বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ১৯২০ সালে ফরাসি সমাজতান্ত্রিক দলের এক কংগ্রেসে এবং এটা বিশ্ব বিপ্লবের জন্য ছিল না বরং 'সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যারা আমার জন্মভূমিতে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে।' তিনি দলটিকে 'নিপীড়িত আদি অধিবাসীদের সমর্থন করার জন্য ফলপ্রসূভাবে কাজ করার' নির্দেশ দেন।

অব্যবহিত পরে হো কালচক্রে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে ওঠেন, কারণ তিনি মনে করেন যে সমাজতন্ত্রীরা ঔপনিবেশিক ইস্যুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে যেখানে কমিউনিস্টরা মানুষের মুক্তির প্রচার করতে ইচ্ছুক।

তিনি প্রতিনিধিদের বলেন, 'কৌশল, চাতুরী এবং আপনারা যে সমস্ত বড়ো বড়ো শব্দ ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমি একটা জিনিস ভালোভাবে বুঝতে পারি; তৃতীয় আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রশ্ন নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। এর প্রতিনিধিরা নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জনগণকে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অনুসারীরা ঔপনিবেশিক এলাকার ভাগ্য সম্পর্কে একটা শব্দও বলেনি।' তিনি আন্তঃ-কলোনিয়াল ইউনিয়নের সাপ্তাহিক পত্রিকা লে পারিয়া (দ্য আউটকাস্ট) সম্পাদনা করেন, ১৯২১ সালে সেই পত্রিকা প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পত্রিকায় যারা অংশ নিয়েছিল তারা ছিল প্যারিসে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং এশীয় নির্বাসিত জনগণ; তারা উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে এবং কিছুটা কমিউনিজমের জন্য এক সাধারণ অঙ্গীকার দ্বারা একত্রিত হয়েছিল।

আমেরিকার ইতিহাস সম্পর্কে হো-এর গভীর জ্ঞান ছিল এবং ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে যখন তিনি ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক রিপাবলিকানের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু মোটের উপর মনে রেখেছিলেন, কিন্তু এর নির্দিষ্ট কথাগুলো মনে রাখতে পারেননি। এক আমেরিকান সামরিক মিশনের সঙ্গে কাজ করে তিনি নথির কপি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কোথাও থেকে তা না পেয়ে হো তাঁর স্মৃতি থেকে এটাকে বানিয়েছিলেন।

এই ভাবে তাঁর ঘোষণা শুরু হয়, 'সকল মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাঁরা তাদের স্রষ্টার দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদত্ত হয়েছেন; এর মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের সাধনা।' এর অর্থ হলো 'পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জন্ম থেকেই সমান, সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার, সুখী এবং মুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে', হো আমেরিকান স্বাধীনতা ঘোষণার পথেই তাঁর জনগণের ক্ষোভগুলো বিবৃত করে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

বিরাট সাহস ও কল্পনার পরিচয় দিয়ে হো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্টদের একটা জোটকে ভিয়েতমিন বা স্বাধীনতা ফ্রন্ট নামে একত্রিত করেছিলেন।

১৯৪২ সালে হো-কে তার আমেরিকান সামরিক সহযোগীদের অনুরোধে কুনমিং-এ পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে চিয়াং কাই-শেকের লোকদের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলে ছিলেন, বলা হয় তখন তিনি মুক্তি পান আমেরিকানদের অনুরোধে।

মিস্টার ফলের বক্তব্য অনুসারে মুক্তির সময়ে হো একজন চীনা জাতীয়তাবাদী জেনারেলের সঙ্গে একটা বিস্তৃত ভিয়েতনামি স্বাধীনতা গোষ্ঠী গঠনে সহযোগিতা করেছিলেন। এর অন্যতম ফলাফল হলো যে ১৯৪৪ সালে হো ভিয়েতনামের অস্থায়ী রিপাবলিকান সরকারের একটা পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সরকার মূলত কাগজেই সীমিত ছিল কিন্তু এটা হো-কে জোরালো ভাবে আমেরিকান অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেসের কার্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। এই ভাবে ১৯৪৫ সালে হো-র ভিয়েতমিন যখন হ্যানয় দখল করে তখন সিনিয়র আমেরিকান সামরিক কর্মকর্তারা তাঁর দলে ছিলেন। এই সময়েই তিনি হো চি মিন নাম গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা ঘোষিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হো ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তার ঘোষণা কার্যকর হতে ৯ বছর লেগেছিল।

প্রথমত পটসডামের চুক্তি অনুসারে চীনা জাতীয়তাবাদীরা হ্যানয় ও ভিয়েতনামের উত্তর সেক্টর দখল করে। দ্বিতীয়ত, ফরাসিরা (ব্রিটিশ জাহাজে) সাইগন এবং দেশের দক্ষিণ অংশ পুনরুদ্ধার করতে এসেছিল। এবং তৃতীয়ত, হো-এর জাতীয়তাবাদী জোট এই ঘটনার ঝাপটায় ফাঁপরে পড়ে যায়।

ভিয়েতমিন নতুন গেরিলা বাহিনী গঠন করে; হো ও তার সহকর্মীরা স্বাধীনতার জন্য হো-এর কায়দায় লড়াই করতে ইচ্ছুক ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে সাময়িক সমঝোতা করেছিলেন। প্রায়ই গুপ্তহত্যায় তাঁরা জড়িত হতেন বলে খবর পাওয়া যেত। ইতিমধ্যে উত্তর থেকে চীনারা সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং ফরাসিরা দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হওয়ায় হো তাঁর জাতীয়তাবাদী শাসনকে বাঁচাতে ফরাসিদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৯৪৬ সালে প্যারিসে হো একটা সমঝোতায় এগিয়েছিলেন, তিনি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনামকে ইন্দোচীন ফেডারেশনের মধ্যে একটা মুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নের অংশ হতে সম্মত হন। ফরাসিরা হো-কে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং হো-এর অধীনে একীভূত ভিয়েতনামের প্রশ্নে দক্ষিণে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৪৭ সালের শুরুতে চুক্তিটি ভেঙে গেল এবং হো-র সৈন্যরা ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করল। ভিয়েতমিন গেরিলারা জঙ্গল ও গ্রাম দখল করে, ফরাসিরা শহর দখল করে। সাত বছর

চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ১৯৭৯

ধরে যুদ্ধ চলছিল সেই সময়ের মধ্যে হো-র বাহিনী শক্তি সংগ্রহ করে ফরাসিদের আরও বেশি করে চেপে ধরে। এই পর্বে বেশিরভাগ সময়, হো কূটনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, কারণ ফরাসিদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় কার্যত নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাননি।

অবশেষে, ৮ মে, ১৯৫৪ তারিখে, ফরাসি বাহিনী ডিয়েনবিয়েনফুতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ইন্দোচীন যুদ্ধ আনুষ্ঠানিক ভাবে জুলাই মাসে শেষ হয়। ফরাসিদের ১৭২০০০ জন হতাহত হয় ও ভিয়েতমিনের সম্ভবত তিনগুণ বেশি হতাহত হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি ২১ জুলাই, ১৯৫৪ সালে জেনেভাতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিন্তু হো-র আশা পূরণ হয়নি। ততদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্ষিক ৮০ কোটি ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে ভিয়েতনামে ফরাসি পক্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল। এশিয়ায় কমিউনিস্ট সম্প্রসারণের ভয় আমেরিকার মনে চেপে বসেছিলয ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম. নিক্সন বলেছিলেন, 'এশিয়ায় আরও কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ এড়াতে হলে, আমাদের সৈন্যদের ঢুকিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে, আমি মনে করি নির্বাহী শাখাকে এটা করতে হবে।'

বলা হয়, হো ছিলেন একজন প্রচণ্ড বাস্তববাদী কমিউনিস্ট, তাত্ত্বিক নন, কাজের মানুষ। ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালের মধ্যে তাঁর বক্তৃতা ও নিবন্ধগুলো হ্যানয়ে চার খণ্ডের 'হো চি মিন-এর নির্বাচিত রচনাবলিতে একত্রিত করা হয়েছিল। ভিয়েতনামের একজন আমেরিকান কর্তা প্রয়াত বার্নার্ড বি. ফল ১৯৬৭ সালে ইংরেজিতে এইগুলোর একটা সংগ্রহ প্রকশ করেছিলেন, শিরোনাম ছিল 'বিপ্লব সম্পর্কে হো চি মিন'। এই রচনাগুলো সহজ স্পষ্ট ভাষায় লেখা যার বেশিরভাগই আন্দোলন কেন্দ্রিক বা বিতর্কমূলক এবং মূল মার্কসবাদী মতবাদের সঙ্গে তার কোনো যোগ একেবারেই নেই।

১৯৬৪ সালের পরে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ বেশি করে ভিয়েতনামের ব্যাপারে জড়িয়েছিল। কারণ তখন হো চি মিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছিলেন। এই কমিউনিস্ট দেশগুলো আদর্শগত কারণে হো-র পক্ষকে খাদ্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের প্রধান সরবাহক ছিল। এটা তাঁর কূটনীতি সম্পর্কে আন্দাজ দেয়— তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন।

হো-এর ক্রিয়াকলাপ তাকে শীর্ষস্থানীয় ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদী এবং জাপানিদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবে বিশ্ব দৃশ্যে তুলে ধরে। 'আমি একজন কমিউনিস্ট ছিলাম', তিনি তখন বলেছিলেন, 'কিন্তু এখন আমি আর কেউ নই। আমি ভিয়েতনামি পরিবারের সদস্য, আর কিছু নয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'কমিউনিজম নয়, দেশপ্রেমই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।' তিনি কোনো কমিউনিস্ট দল গড়েননি যা করেছিলেন তা ভিয়েতনামের স্বাধীনতার লক্ষ্যে, 'আমি শুধুমাত্র একটি দল অনুসরণ করি; ভিয়েতনামি দল'। শোয়েনব্রুনকে বলেছিলেন, 'মিস্টার শোয়েনব্রুন, আমাদের কাছে একটি গোপন অস্ত্র আছে... আমি যখন আপনাকে বলব তখন হাসবেন না। আমাদের গোপন অস্ত্র জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ পরিপক্কতার লক্ষণ, তা বিশ্বের যে কোনও অস্ত্রের চেয়ে বড়ো। ৩০ এপ্রিলের মহান বিজয় সমগ্র জাতির বিজয়, বর্বরতার বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতার বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের দক্ষিণী দেশবাসীর দ্বারা নথিকৃত সাফল্যগুলো দেখায়

ভিয়েতনাম-ফ্রান্স যুদ্ধ, ১৯৪৯

যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যত আধুনিক অস্ত্রই থাকুক না কেন তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ

দেং জিয়াওপিংয়ের অধীনে চীন অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করছিল এবং পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্য চালু করছিল, ফলস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিদ্বেষী হয়ে উঠছিল। চীন ভিয়েতনামের উপর শক্তিশালী সোভিয়েত প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এই ভয়ে যে ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ছদ্ম-আশ্রিত দেশ হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধে জয়লাভের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি হিসেবে ভিয়েতনামের দাবিও চীনাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। চীন ভেবেছিল ভিয়েতনাম গোটা ইন্দোচীনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে একটা আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী নীতি অনুসরণ করবে। জুলাই ১৯৭৮ সালে, চীনা পলিটব্যুরো সোভিয়েত দেশকে আটকাতে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে এবং দুই মাস পরে পিপলস লিবারেশন আর্মির জেনারেল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করে, মানে যুদ্ধ। তারা ভিয়েতনামে উত্তরে কয়েকটি শহর ও তৈল খনি দখল করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিয়েতনামে নৌবহর পাঠিয়েছিল ও উপকরণ সরবরাহ করেছিল, কিন্তু তখন তারা মনে করেছিল যে চীনের বিরুদ্ধে সরাসরি ভিয়েতনামকে সমর্থন করার কোনো উপায় নেই; ভিয়েতনামের কার্যকর মিত্র হওয়ার পক্ষে ওই দেশের দূরত্ব খুব বেশি বরং ভিয়েতনামকে চীনের বিরুদ্ধ লড়তে গেলে চীন বা মার্কিন মিত্রদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল পেরোতে হবে। ভিয়েতনাম সোভিয়েত নীতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু সোভিয়েতদের যুদ্ধে সরাসরি যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড কাজ করেনি।

চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘাত

১৯৬৯ সালে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কে ভাঙন ধরলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সাত মাসের অঘোষিত সামরিক সংঘর্ষ বাঁধে— বিশ্বের দুটি বৃহত্তম কমিউনিস্ট দেশকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে, সবচেয়ে গুরুতর সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটে মাঞ্চুরিয়ার উসুরি (বা, উসুলি) নদীর উপর ঝেনবাও (দামানস্কি) দ্বীপের কাছে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। জিনজিয়াংয়েও সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে সোভিয়েতরা জিতেছিল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয় এবং স্থিতাবস্থা ফিরে আসে। দ্বন্দ্ব ছিল সীমান্ত নিয়ে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, জাতীয়তাবাদ এখানে কাজ করেছিল। চীন তিব্বত, অরুণাচল প্রদেশের ৩২ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা, আকসাই চীন, দক্ষিণ চীন সাগরের অনেকগুলো দ্বীপ জবরদস্তি দখল করে রেখেছে— স্রেফ জাতীয়তাবাদ। রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ১৫টি দেশ দখল করেছিল— তাও জাতীয়তাবাদ। ১৯৮৯ সালের পর সেই দেশগুলি বেরিয়ে স্বাধীন হয়, সবচেয়ে আগে গিয়েছিল মুসলমান প্রধান দেশগুলি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ জাতীয়তাবাদের লক্ষণ। জাতীয়তাবাদের আরও লক্ষণ— আমেরিকার সব বড়ো শিল্পের অবস্থান চীনে; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা বিনিয়োগ করেন শি জিনপিং। আমেরিকায় অভিবাসীদের মধ্যে চীনারা বৃহত্তম। ভিয়েতনামে সবচেয়ে বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করেছে আমেরিকা। কিউবার রাউল কাস্ত্রো আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি করছে। □

চব্বিশের নির্বাচনে রামধনু জোটের সম্ভাবনা

তারক সাহা

সম্প্রতি সুরাট দায়রা আদালতে ফের ধাক্কা খেলেন রাহুল গান্ধী। দায়রা আদালতের বিচারক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন রাহুল গান্ধী দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতা। ভাষণ দেবার সময় তাঁর আরও সতর্ক থাকা উচিত। তাই দায়রা আদালত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখল। এই রায়ও কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে রাখল। এই রায়ে আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি স্বাভাবিকভাবেই আদালতের সমালোচনায় মুখর হবেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সিবিআই-ইডি বিভিন্ন দুর্নীতির মামলার তদন্ত চালাচ্ছে, তাতে স্পষ্টত দেশের বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে এক মঞ্চে জড়ো করছে বলে সংসদে কটাক্ষ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

আমাদের এ রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে গোরু, বালি প্রভৃতি বিভিন্ন মামলায় আদালত সাঁড়াশির চাপ বাড়াচ্ছে তাতে দলের শীর্ষ নেতাদের রাতের ঘুম কেড়েছে। তাই অস্বস্তিতে পড়ে বাধ্য হয়ে চব্বিশের নির্বাচনে একটি অনৈতিক জোটের চেষ্টা চলছে দেশে। পরস্পর বিরোধী জোট কীভাবে সম্ভব সেটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা চলছে। এই যেমন সাগরদীঘিতে পরাজয়ের পরেই ময়নাতদন্তে নামে রাজ্য শাসকদল। একটা উপনির্বাচনে হার ২১৩টি আসনে জেতা একটি দল সাধারণভাবে উপেক্ষা করতেই পারে। আবার কংগ্রেসের কাছে এই জয় তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ একুশের বিধানসভার নির্বাচনে শূন্য পাওয়া দলটি একটি আসন পেয়ে খানিকটা অক্সিজেন পেল। রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরীর মুখরক্ষা হলো। কিন্তু মুশকিল হলো তৃণমূলের। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে অভূতপূর্ব ক্ষয়। একুশের 'দুধেল গাই' এমনভাবে মুখ কেন ফেরালো তার নিয়ে বিস্তর চর্চা দলে। একুশের বিধানসভার নির্বাচনে সংখ্যালঘুরের ভোট তিন দলের মধ্যে ভাগ হলেই বিপাকে পড়ত দল। আর এটাই চিন্তায় রেখেছে দলকে।

সাগরদীঘিতে পরাজয়ের পরেই দলের শীর্ষ নেত্রীর মন্তব্য চব্বিশের নির্বাচনে একলা চলো নীতি নিয়ে চলবেন। তাঁর মন্তব্য, রাহুল যে দলের নেতা সেই দলের জোট কীভাবে মোদীকে হারাবে? আবার সুরাটের আদালতের রায়ে রাহুলের দু' বছরের কারাদণ্ডের আদেশের পর রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেলে নেত্রীর মতের বদল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাহুলের পেছনে দাঁড়িয়ে জোট গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

আবার শীর্ষ আদালতে নিয়োগ মামলার বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এক মামলায় কংগ্রেসের আইনজীবী নেতা যিনি আবার তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ অভিজিৎ মনু সিঙ্ঘভি তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করায় বেজায় চটেছেন রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা। এই রকম নীতিগত বৈপরীত্য নিয়ে কীভাবে দুটি দল কাছাকাছি আসতে পারে? এই কিছুদিন আগে তৃণমূলের নেত্রী অযাচিতভাবে ভুবনেশ্বরে গিয়ে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে মোদী বিরোধী জোটের আশায়। জোট না থাকলেও এনডিএ-র সঙ্গে নবীনের সখ্য আজও অটুট। অতীতে সংসদে বিল পাশের সময়ে বার বার মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছে নবীনের দল। সুতরাং সেখানে নবীনকে জোটে আনা অসম্ভব।

অতি সম্প্রতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নবান্ন ঘুরে গেলেন, সঙ্গে তাঁর দোসর লালুপুত্র তেজস্বী। উদ্দেশ্য সেই জোট। ভারতীয় রাজনীতিতে নীতীশের নাম বিখ্যাত হয়ে থাকবে সবচেয়ে বেশি দলবদলু হিসেবে। বিহারের গত বিধানসভার নির্বাচনে রাজ্যের দু' নম্বর দল হলেও এক নম্বর দল বিজেপি কিন্তু জোটধর্ম মেনে, বদান্যতা দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছেড়ে দেয় নীতীশের জন্য সুশীল মোদীকে বঞ্চিত করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নীতীশ নীতিমালার পাঠ কোনোদিন পড়েননি বলেই গাঁটছড়া বাঁধেন একদা দোসর-দুশমন লালুর দলের সঙ্গে। এহেন ব্যক্তি চব্বিশের নির্বাচনের জন্য জোটের আশায় নবান্ন ঘুরে গেলেন সঙ্গে লালুর পুত্র। ভোটের আগে সাজা প্রাপ্ত আসামি আনন্দ মোহনকে মেয়াদের আগেই ছেড়ে দিল নীতীশের সরকার। উদ্দেশ্য নয়ের দশকেরর অরাজক বিহারের পরিস্থিতি তৈরি করা চব্বিশে। সেই নীতীশ জোটের লক্ষ্যে নবান্ন ঘুরে গেলেন দুর্নীতিতে হাত পাকানো এক নেত্রীর সঙ্গে জোট পাকানোর লক্ষ্যে।

ওদিকে কেজরিওয়ালের দল জোটের অংশীদার হিসেবে যোগ দিলে বেঁকে বসবে কংগ্রেস। রাজনৈতিক কারণে কেজরিওয়ালের দল কংগ্রেসের এক নম্বর দুশমন। এদিকে কেজরিওয়ালের দুই মন্ত্রী জেলে লিকার মামলার অভিযুক্ত হয়ে। দিল্লিতে সাড়ে সাত একর জমিতে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার বিলাসবহুল বাড়ি বানিয়েছেন একদা আন্না হাজারের দুর্নীতি মোচন আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির। আবার কবে ইডি, সিবিআই তদন্তের আওতায় আসেন কেজরিওয়াল।

এইসব রাজনৈতিক প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে তারা জোটের সঙ্গী করতে চাইছে না কংগ্রেসকে, তাদের মানতে হবে দল যতই দুর্বল হোক দেশে বিজেপির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। চব্বিশের নির্বাচনে একাই আড়াইশোর বেশি আসনে কংগ্রেস লড়বে। জোট নিয়ে যতই চর্চা হোক জোটের জট কিছুতেই খুলতে চাইছে না। ব্যঙ্গ তামাশা করে এই জোটকে অনেকেই রামধনু জোট বলেন। কিন্তু কেন? ঝড়-বৃষ্টির পড়ে অনেক সময়েই আকাশে সাতরঙা রামধনু দেখা যায়। এই সাতটি রং ভিন্ন ধর্মী। আবার একটা সময়ের পর আবার মিলিয়ে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এমন রামধনু দেখা যায়, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ দল দুর্নীতিতে যুক্ত। এই সংকট কাটাতে তারা একটা জোট গড়তে চাইলেও এই রামধনুর মতো জোট প্রায় অসম্ভব।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের নির্বাচন সব রাজনৈতিক দলের কাছে একটা পরীক্ষা। কংগ্রেস ভালো ফল করলে জোটের পক্ষে সওয়াল আরও জোরদার যেমন হবে, তেমনি কংগ্রেস ফল খারাপ করলে তাকে জোট থেকে ঝেড়ে ফেলার পক্ষে সওয়াল আরও জোরালো হবে। পরিণতি বিজেপির পক্ষে। ▯

কেউটে ও পিঁপড়ের দল

জঙ্গলের মধ্যে একটি বড়ো উইঢিবিতে অতিদর্প নামে এক কালকেউটে বাস করত। সে ওখানে বসেই শিকার ধরত। ইঁদুর, ছুঁচো, ব্যাং ধরে ধরে খেত।

দুষ্ট কেউটের স্বভাব সকলেই জানত। তাই কোনো দরকার না পড়লে কেউ ওই উইঢিবির আশেপাশে যেত না। অতিদর্প ঢিবির বাইরে মাথা বের করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। কোনো জন্তু আসতে দেখলেই ফণা বাগিয়ে ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে যেত।

কেউটের শরীরটা ছিল বেশ হৃষ্টপুষ্ট। একদিন সে কী ভেবে ঢিবি থেকে বেরোবার সোজা রাস্তা ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে বের হতে গেল। রাস্তাটা ছিল খুব সরু। তার চলার পক্ষে কষ্টদায়ক। তবু সে দমল না। ওই পথ দিয়েই গায়ের জোর খাটিয়ে, টেনে হিঁচড়ে শরীরটাকে বাইরে আনল। যখন সে বাইরে এল, তার শরীরে এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। এমনকী তার দম নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। সে ক্ষতবিক্ষত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারল না। নেতিয়ে ওখানেই পড়ে রইল।

এদিক রক্তের গন্ধ পেয়ে সারি সারি পিঁপড়ে এসে হাজির হলো। ঘিরে ধরল তার শরীরটাকে। চামড়া ফেটে কষ্ট হচ্ছে, তার ওপর পিঁপড়ে কামড়। বেচারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ল। পিঁপড়েগুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করল। গড়াগড়ি দিতে লাগল। তার শরীরে তলায় পড়ে অনেক পিঁপড়ে মারা গেল। তবু পিঁপড়েগুলি রণে ভঙ্গ দিচ্ছে না। তাদের পালাবার নামটি পর্যন্ত নেই। আরও বেশি করে তারা কেউটেটাকে ছেঁকে ধরল। তার শরীরের চামড়া কেটে নিতে লাগল।

অতিদর্প পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠল। বারাবর গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিন্তু পিঁপড়েদের ছাড়বার নামই নেই। পিঁপড়ের কামড়ে কামড়ে কাহিল হয়ে পড়ে রইল। এইবার পিঁপড়ের দল তার পুরো শরীরটাকে ঢেকে ফেলল। আর তার শরীর থেকে মাংস কুরে কুরে খেতে লাগল। সংবাদ পেয়ে আরও দলে দলে পিঁপড়ে এসে জুটল। যাদের পেট ভরে গিয়েছিল, তারা মাংসের টুকরো মুখে করে তাদের বাসার দিকে চলতে লাগল। এক সময় দেখা গেল, কেউটের কঙ্কালটি শুধু পড়ে আছে।

অতিদর্প ছিল ভীষণ শক্তিশালী, কিন্তু সে ছিল একা। পিঁপড়েরা ছিল দলবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ। ক্ষুদ্র প্রাণী হয়েও তাদের মধ্যে ছিল একতা। তাই বলা হয় একতাই বল।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

বীর বুধু ভগত

জন্ম ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বর্তমান ঝাড়খণ্ডের রাঁচী জেলার সিলগাই গ্রামে এক কৃষক পরিবারে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছোটনাগপুর এলাকায় ইংরেজদের বর্বরতা চরমে উঠেছিল। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার কোল জনজাতি যোদ্ধাদের বিদ্রোহে ইংরাজ শাসন কেঁপে উঠেছিল। এলাকা থেকে তাঁরা ইংরেজদের উৎখাত করেছিলেন।১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ইংরাজ সেনা তাঁদের গ্রাম ঘিরে ফেলে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। তাতে ৩০০ গ্রামবাসী মারা যায়। বুধু ভগতের নেতৃত্বে কোল যোদ্ধারা মরণপণ যুদ্ধ করে সবাই বীরগতিপ্রাপ্ত হন।

জানো কি?

- বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই।
- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবচেয়ে বেশি বৃহস্পতি গ্রহের।
- অমাবস্য তিতিতে সূর্যগ্রহণ হয়।
- পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
- সূর্যের আলো পৃতিবীতে আসতে ৮মিনিট ১৮ সেকেন্ড সময় লাগে।
- যতদূর পর্যন্ত পৃথিবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে, ততদূর পর্যন্ত আকাশ। তারপর মহাকাশ।

ভালো কথা

আমাদের সোনাই

আমাদের টিয়াপাখিটির নাম সোনাই। ওকে আমরা খাঁচায় রাখি না। প্রথমে কিনে এনে খাঁচায় রাখা হতো। ছোটো মামা একবার বেড়াতে এসে মাকে বলেছিল, ওরা বনের স্বাধীন প্রাণী। ওদের খাঁচায় রাখতে নেই। সেই হতে মা আর কখনো ওকে খাঁচায় রাখেনি। আমাদের পুশির সঙ্গে ওর খুব ভাব। সকাল হলেই বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে দেয়। একমাস আগে ও একটা ডিম পেড়েছিল। সারাদিন ডিমের উপর বসে থাকত। একমাস হলেও যখন ডিম ফুটে ছানা বের হচ্ছে না , তখন ও নিজেই ভেঙে ফেলে। অসলে ডিমটা পচে গিয়েছিল। সেদিন সারাদিন শুধু কেঁদেছিল। মা অনেক আদর করাতে শান্ত হয়েছিল।

স্বর্ণালি সরদার, অষ্টম শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র র্তা ব

(২) য়ে মে ক্ষ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রী প সু মা ন্দ র

(২) ণ মু র্ষ র ব খ

১ মে সংখ্যার উত্তর

(১) দোলযাত্রা (২) ধানিজমি

১ মে সংখ্যার উত্তর

(১) হৃদয়বিদারক (২) সিংহাসনচ্যুত

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রামনগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৮ পরগনা। (২) স্নেহাংশু দাস, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা (৩) অপরূপা হালদার, ১৮ মাইল, বৈষ্ণবনগর, মালদা। (৪) সুজন সরকার, বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

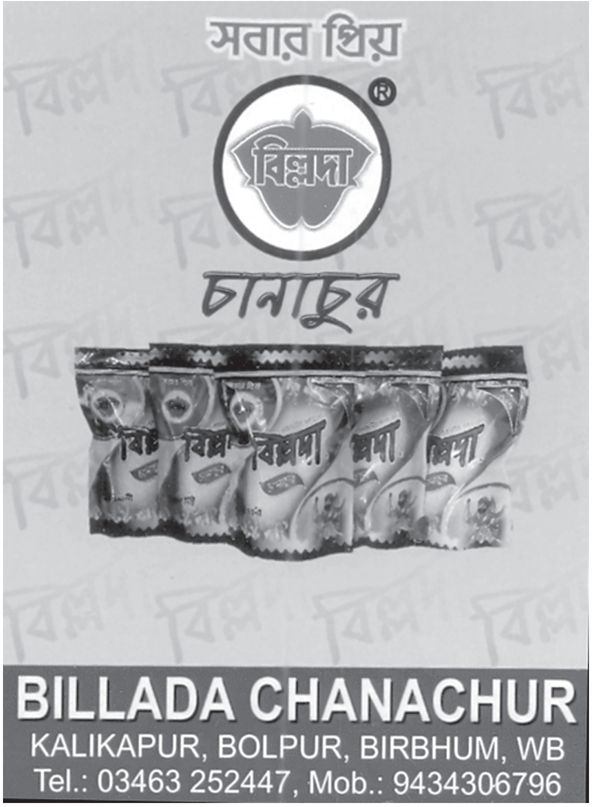

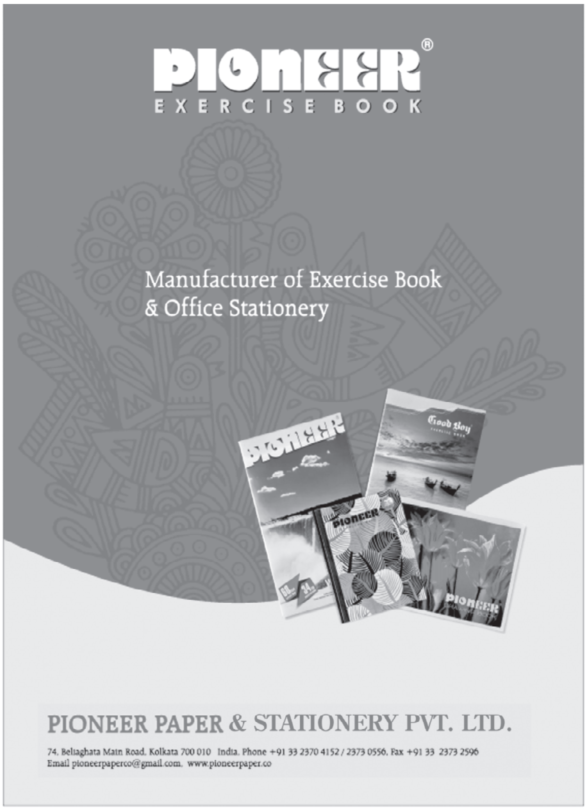

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সত্যজিতের শ্যামাসংগীতে রামপ্রসাদী ছোঁয়া

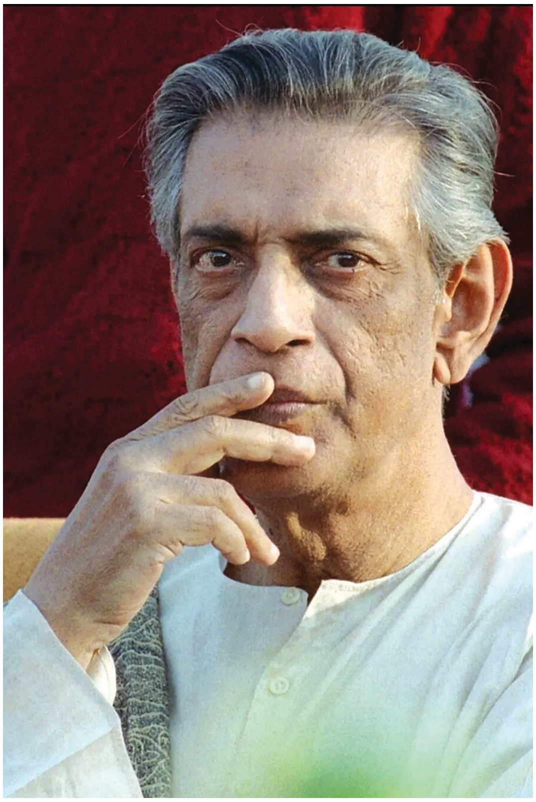

ডঃ জয়ন্ত কুশারী

গীতিকার হিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন সাবলীল। স্বচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ আর অননুকরণীয়। তা বলে শ্যামাসংগীত? এও কি ভাবা যায়?

আসলে তিনি তো সত্যজিৎ। তাঁর অভিধানে 'না' শব্দটি নেই। তাই এবার তিনি লিখলেন শ্যামাসংগীত। দিলেন সুরও। কণ্ঠদান করলে অবাক হতাম না আমরা। কেন না, পরবর্তীকালে তিনি কণ্ঠদান করেছেন। আগন্তুক ছবিতে। চার লাইনের একটি পদ। মনে পড়ে যায়, গুরুগম্ভীর গলায় ধরলেন 'হরি হরয়ে নমো বিষ্ণু যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...।' লিপ্ দিলেন উৎপল দত্ত। কিংবা, গাইলেন 'অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ....।' অথবা কণ্ঠ দিলেন, 'রহু ধৈর্যং, রহু ধৈর্যম্...।' ওই আগন্তুক ছবিতেই। লিপ্ দিয়েছিলেন সেই উৎপল দত্তই। আসলে তিনি মানিক (মানিক, সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম)। সাত রাজার ধন। তাই এহেন মণিমুক্তো ছড়িয়ে রেখে গেছেন তিনি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মে।

সে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' থেকে 'গুপী বাঘা ফিরে এল' পর্যন্ত। 'শাখা- প্রশাখা'-তেও তার নিদর্শন রেখে গেছেন। 'হীরক রাজার দেশে' ছবির হীরক রাজার দরবারের সংলাপগুলো রচনা করলেন ছন্দের মাধ্যমে। কাব্যের সমস্ত গুণ যেখানে বর্তমান। আছে বক্রোক্তি। আছে শ্লেষ। আছে খেদোক্তি। আছে ব্যঙ্গোক্তি। আছে নগ্ন স্তাবকতা। আছে নিপীড়কের প্রতি নিপীড়িতের সোচ্চার প্রতিবাদ। আছে মগজধোলাই যন্ত্রের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা হরণ। আছে স্বৈরাচারী শাসকের অপশাসনের বাণী মগজে প্রতিস্থাপন। নিপীড়িত-শোষিত শিক্ষক-কৃষক-শ্রমিক-মজুরের আপোশহীন সংগঠিত সংগ্রাম। অবশেষে সত্যের জয়। ন্যায়ের জয়। ধর্মের জয়। কী নেই এই ছবিতে? তাঁর দেওয়া সুর তো আজও ঝংকার তোলে আমাদের মনোজগতের সুরমূর্ছনায়। অনাবিল আনন্দ অনুভব করি আমরা। অর্থাৎ আট থেকে আশি সকলেই। একই বক্তব্য আগামী পৃথিবীর জন্য। ভাবতে শেখায়, কীভাবে তিনি ভারতীয় রাগ সংগীতের সুর-তাল-লয়কে অক্ষুণ্ণ রেখে সুরারোপ করলেন ছবির চরিত্রানুগ সংগীতে। যা স্বীকৃতি পেল সারা পৃথিবীর সংগীতবোদ্ধাদের কাছ থেকে। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত থেকে লঘু সংগীতের অলিতে গলিতে তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। আবার পাশ্চাত্য সংগীতের বৃহৎ আঙিনায় তিনি পা রেখেছেন দৃপ্তভাবে। এমন অনেক নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টিশৈলীতে। ছবির চাহিদা অনুযায়ী কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্র সংগীতকেও। যা শুধু সংগীত পিপাসুদের সুর সাধনার উপকরণ। এবার শাক্ত সাধকদের আর ভক্ত সাধারণদের উজ্জীবিত করলেন শক্তিসাধনায় আর ভক্তিবোধে। একই সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখলেন ছবির চরিত্রের সঙ্গে। দর্শককুল খুঁজে পেলেন আজানা সত্যজিৎ রায়কে। তৃপ্তি পেলেন জানা-র (সত্যজিতের) মাঝে অজানা-র (সত্যজিতের) সন্ধান পেয়ে। বলতে ইচ্ছে করছে—এবার তোরে চিনেছি 'Ray' (Ray, মানে সত্যজিৎ রায়)। এখন শুনব তাঁর রচিত ও সুরারোপিত শ্যামা সংগীতটি।

''এবার তোরে চিনেছি মা।/ও তোর নামে কালী, মুখে কালী / অন্তরে তোর নাই কালিমা। / নামে কালী মুখে কালী / অন্তরে তোর নাই কালিমা / এবার তোরে চিনেছি মা। / যে বলে মা তুই পাষাণী, তারেই আমি বেকুব মানি।।/আমি মনে জানি, প্রাণে জানি পাষাণের ওই কী মহিমা। / এবার তোরে চিনেছি মা।। / নূতন রূপে নূতন বেশে, / শ্যামা মায়ে দ্যাখো এসে।। / ও তাঁর দয়ার পরশ পেয়ে হরষ-দয়াময়ী গো / দয়ার পরশ পেয়ে হরষ-দয়াময়ী গো / দয়ার পরশ পেয়ে হরষ আনন্দেরই নাই কো সীমা। / এবার তোরে চিনেছি মা / নামে কালী, মুখে কালী / অন্তরে তোর নাই কালিমা / ও তোর নামে কালী, মুখে কালী / অন্তরে তোর নাই কালিমা / এবার তোরে চিনেছি মা।''

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'দেবী' ছবিটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ। ছবিটি ১৯৬০ সালের। ছোটো গল্পকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গল্পটির লেখক। সংগীত পরিচালক ওস্তাদ আলি আকবর খান। তবে শ্যামাসংগীতটির সুর দেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ-ই এই শ্যামা সংগীতের পদ রচনা করেন। রামপ্রসাদী গানের আদলে সত্যজিতের পদ রচনা। আর সুরারোপও। গানটি কোনো প্রথিতযশা শিল্পী গাননি। গানটি গেয়েছেন পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী ছিলেন পৃথ্বীশ। তাঁকে এই গানে কণ্ঠ দেওয়ানো

আর তাঁর সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে উপরি পাওনা। এবং তাৎপর্যপূর্ণও বটে। পৃথ্বীশের গাওয়া এই গানটিতে লিপ দিয়েছিলেন জনৈক ভক্ত। যিনি বসেছিলেন কালী মন্দিরের দাওয়ায়। এখন আসা যাক্, গল্পের বিষয়বস্তুতে।

গ্রামের মানুষ কালীকিঙ্কর। শিক্ষিত। দয়াদাক্ষিণ্যযুক্ত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। তিনি কালীসাধক আবার সংসারীও। সংসার প্রতিপালন করলেও অধিকাংশ সময় তাঁর কাটে কালীসাধনায়। রক্ত বস্ত্র আর নামাবলিই মূলত তাঁর পোশাক। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম বৈরাগ্য। চণ্ডীপাঠ আর কালীসাধনাকে অবলম্বন করে সারাদিন অতিবাহিত করেন তিনি। দুই ছেলে এবং দুই বউমা। বড়ো ছেলে তারাপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী হরসুন্দরী। আর ছোটো ছেলে উমাপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী দয়াময়ী। এঁদের কোনো সন্তান হয়নি। তবে বড়ো ছেলের এক ছেলে। নাম খোকা। খোকা সারাদিন কাকিমা দয়াময়ীর কাছেই থাকে এবং ভালবাসেও তাঁকে। মায়ের চেয়েও। এতে হরসুন্দরী কষ্ট পায়। ফলত তিনি দয়াময়ীকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

কালীকিঙ্কর একদিন স্বপ্নে দেখেন, যে কালীর সাধনা তিনি করেন, সেই কালীই এখন তাঁর বাড়িতে আছেন ছোটো বউমা দয়াময়ীর রূপ ধরে। এরপর তিনি ভোররাতেই ছোটো ছেলে উমাপ্রসাদের ঘরে টোকা দেন। উমাপ্রসাদ দরজা খোলেন। ভাবাবিষ্ট কালীকিঙ্কর সটান ছোটো বউমা দয়াময়ীর পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। চকিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি মোটেই ভালো লগেনি দয়াময়ীর আর উমাপ্রসাদের। উভয়ের দেহের ভাষা বুঝতে পেরে কালীকিঙ্কর স্বপ্নাদেশের কথা বলেন। তারপর থেকে ছোটো বউমা দয়াময়ীকে দেবীজ্ঞানে পুজো করতেন কালীকিঙ্কর। ক্রমে ক্রমে এই বার্তা রটে গেল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। রাতে উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর দেবীসত্তা নিয়ে দয়াময়ীকে প্রশ্ন করলে দয়াময়ী অস্বীকার করেন। তিনি নিজেকে মানবী রূপেই ভাবেন। এরপর তাঁরা ঠিক করেন, বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। কিন্তু বিধি বাধ সাধল। পরের দিন সকালে গ্রামের এক বৃদ্ধ তাঁর মরণাপন্ন পিতৃহারা নাতিকে সুস্থ করার জন্য দয়াময়ীর কাছে নিয়ে আসে তাঁর বউমাকে সঙ্গে নিয়ে। বাচ্চাটিকে গায়ে-মাথায় হাত বোলান আর মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন বাচ্চাটিকে সুস্থ করার জন্য। ক্রমে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে দয়াময়ীর মাহাত্ম্য আরও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর উমাপ্রসাদ দয়াময়ীকে রাজি করান পশ্চিমে যাওয়ার জন্য। দয়াময়ী তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু গভীর রাত্রে যাওয়ার সময় বেঁকে বসেন দয়াময়ী। তিনি বলেন তাঁর দেবীসত্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁকে অনেক মানুষকে ভালো করতে হবে। তাই তাঁকে থেকে যেতে হবে। অগত্যা উমাপ্রসাদ একাই চলে যান পশ্চিমে। ক্রমে ভক্তের ঢল নামে দয়াময়ীর কাছে।

কিছুদিন পর এক মহিলা তাঁর মুমূর্ষু মেয়েকে নিয়ে আসেন দয়াময়ীর কাছে। মেয়েটির মা আবার দয়াময়ীর বাল্য বান্ধবী। দয়াময়ী তাঁর এই বাল্য বান্ধবীকে চিনতে পারেন। এবারও দয়াময়ী মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন। আর বাচ্চা মেয়েটির গায়ে মাথায় হাত বোলান। কালীকিঙ্কর নিদান দেন অসুস্থ মেয়েটিকে দয়াময়ীর চরণামৃত পান করাতে। মহিলাটি তৎক্ষণাৎ দয়াময়ীর চরণামৃত পান করান অসুস্থ মেয়েটিকে। এবার মেয়েটি আস্তে আস্তে চোখ মেলে চায়। ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। দয়াময়ীর এই দেবীভাব সকলে মেনে নিলেও, মানতে পারলেন না হরসুন্দরী। তাঁর কাছে এটা অন্ধবিশ্বাস। জাত অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। তাই তিনি এই ভাবের ঘোর বিরোধী।

অবশেষে এল সেই দিন। যেদিন বাড়ির একমাত্র ছেলে চরম অসুস্থ হলো। হরসুন্দরী চাইলেন তাঁর ছেলের যথাযথ চিকিৎসা হোক একজন ডাক্তারকে দিয়ে। খোকা তাতে সুস্থ হবে। স্বাভাবিকভাবে। বিরোধিতা করল বাড়ির আর সকলে। তাঁরা বললেন, দয়াময়ীই খোকাকে সুস্থ করে তুলবে। হরসুন্দরী প্রতিবাদ করলেও তা ধোপে টিকলো না। তখন কালীকিঙ্কর দয়াময়ীকে বললেন, মা ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই তো? তুমিই খোকাকে সারিয়ে তুলবে তো? খোকাকে সুস্থ করে দেবে তো? এতে সায় দিল দয়াময়ী। তখন অসুস্থ খোকাকে রাখা হলো দয়াময়ীর কাছে। পুত্রবৎ ভাসুরপো খোকার সুস্থতার জন্য অনেক প্রার্থনা করলেন দয়াময়ী। কিন্তু, শেষ রক্ষা হলো না। এরপর নিজের অলীক ক্ষমতা জাহির করে যমরাজকে ভর্ৎসনা করলেন দয়াময়ী। খোকার প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু, খোকার প্রাণ আর ফিরল না। হরসুন্দরীর একমাত্র ছেলের মৃত্যুশোক পরিণত হলো তীব্র বিষোদ্‌গারে। দয়াময়ীকে তিনি ধিক্কার দিয়ে বললেন, ডাইনি, রাক্ষসী! আমার একমাত্র ছেলেকে শেষ পর্যন্ত খেয়ে ছাড়লি। কালীকিঙ্কর এতে দয়াময়ীর কোনো দোষই দেখতে পেলেন না। এদিন দয়াময়ী একেবারে নিথর-নীরব হয়ে গেলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি নিজের শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পরের দিন সকালে সপুত্র কালীকিঙ্কর দরজা খুলে দেখলেন সেই নিষ্ঠুর পরিণতি।

এবার আমরা শুনব সত্যজিৎ রায় রচিত এবং সুরারোপিত শ্যামা সংগীত বিষয়ে কী জানিয়েছেন? নিজের উপলব্ধির বিষয়ে কী বলছেন? সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্কেই-বা কী বলেছেন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ? আমরা শুনব সে কথা।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ (যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) এই শ্যামাসংগীতটি শুনে তাঁর উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন সাংবাদিক তরুণ গোস্বামীর কাছে। এখন আমরা সেই উপলব্ধির কথা শুনব—'বারবার ওই গানটি শুনলে বোঝা যায় সত্যজিৎ রায় কোন স্তরের ভক্ত ছিলেন। কী গভীর তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা তা টের পাওয়া যাবে।' সত্যজিতের ওই একটিমাত্র শ্যামা সংগীতের গূঢ় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এমনই দাবি করেছিলেন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ।

একটি ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন সত্যজিৎ। বাবা সুকুমার রায়। ব্রাহ্ম ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তাঁর পরিবারে নিয়মিত ব্রহ্মসংগীত চর্চার আসর বসত। একথা সত্যজিৎ বহুবার বলেছেন, তাঁর লেখায় ও সাক্ষাৎকারে। তবে পরবর্তীতে তিনি পুরোপুরি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়। নিজেই জানিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ী। সিনেমায় ধর্মীয় লোকাচার নির্ভর সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠতাকে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

স্বভাবতই ওই শ্যামাসংগীতের পদকর্তার যে আধ্যাত্মিক কথা স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, তা সত্যজিতের অন্যান্য সৃষ্টিকর্মে অধরা থেকে গিয়েছে। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয়, পুরোদস্তুর ব্রাহ্ম দর্শন তাঁর ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল, তাহলে কোনো প্রকার হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগ বা পৌত্তলিকতায় তাঁর আস্থা না থাকাটাই স্বাভাবিক। এহেন সত্যজিৎ রায়ের লেখা ও সুর করা শ্যামা সংগীতে কিন্তু ভক্তিভাবের কোনো অভাব ছিল না। পেশাদারি সৃজনশীলতা নাকি ভক্তিরস, কী সেই তাড়না যা সত্যজিৎকে দিয়ে এহেন পদ রচনা আর সুর সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল? সে তর্ক তোলা থাক্ গবেষকদের জন্য।

তথ্যসূত্র ঃ *সত্যজিৎ রায়ের শ্যামাসঙ্গীত : ভক্তিরস নাকি পেশাদারি সৃজনশীলতা। জয়ন্ত চৌধুরী, কলকাতা টিভি ওয়েভ ডেস্ক।*

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বুদ্ধি

কমলেশ সরকার

বর্তমান কলমচির শূন্যগর্ভ কচকচি কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের জন্যে নয়। কারণ একটাই, কলমধারীটি নিজে আগাপাশতলা নির্বোধ। বাস্তব সমাজের প্রেক্ষাপটে একটা আস্ত আকাট মুখ্যু— যেহেতু সে আজন্ম অধূমপায়ী। আমাদের চারপাশে যে দিকেই তাকাই, বুদ্ধিজীবী মানুষেরা ধূমপান করেন। ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, রাজনীতিক, গবেষক, সমাজকর্মী বা অন্য সব বুদ্ধিজীবী মানুষদের অধিকাংশই ধূমপায়ী। আবার যিনি যত বড়ো নামজাদা বুদ্ধিজীবী, তিনি তত বেশি বেশি করে ধূমপায়ী। অনেকে আবার সুশৃঙ্খল (নাকি সশৃঙ্খল?) ধূমপায়ী, সভ্য ভাষায় chain smoker (অথবা chained smoker?)। দেখে শুনে মনে হয়, ধূমপানই বুদ্ধির উৎস। ঈশ্বর বা প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধি তো পৃথিবীর সমস্ত জীবেরই আছে। শুধুমাত্র সেটুকুতে তো আর মানুষের কোনো বিশেষত্বই নেই। তাই চালাক মানুষেরা ধূমপানের উত্তাপে নিজেদের বুদ্ধিকে আরও বেশি পরিণত, আরও বেশি পরিপক্ব করে তোলেন, আগেকার দিনে যেভাবে গাঁয়ের মানুষ ধোঁয়া দিয়ে অপোক্ত কলা পাকাতেন, তেমনি বোধ হয়।

যাই হোক, অধূমপায়ী এই কলমধারী, অতএব, বুদ্ধির অপরিণত দশা নিয়েই রইল জীবনভর। আমার জানা অনেক নির্বোধ (অস্যার্থে অধূমপায়ী) বিবাহ-উত্তরকালে নবপরিণীতা ঘরনির সপ্রতিভ প্রেরণায় সিগারেট ধরে, নির্বুদ্ধিতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে, বুদ্ধিশলাকার দীপ্তিতে জ্বলন্ত হয়েছেন। কপালগুণে এ কলমধারীর পত্নীরত্নটির যুগোপযোগী উদ্যোগের অভাবেই হোক, আর ধূমপানের পরিণতি বিষয়ক কিছু কিছু কুরচনা পাঠের ফলেই হোক, এ জীবনে তার আর বুদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটলই না। এমনকী স-বুদ্ধি (সুবুদ্ধি) লোকেদের সাহচর্য পর্যন্ত তার ধাতে তেমন সয় না। তাঁরা যখন তখন ধোঁয়ার চাবি দিয়ে বুদ্ধির ভাঁড়ারঘর খোলেন, আর পাশে-বসা এ কলমচি কেশে মরে, তার দম বন্ধ হয়ে যায়। হবেই তো, বাঁদরে কি বোঝে মুক্তার মর্ম? এ মূর্খও বুঝল না বুদ্ধির স্বাদ। আসলে, এত যে স্বাদের বস্তু ঘি, তাও তো সবার পেটে সয় না।

এমনতরো সাত-সতেরো, আবোল তাবোল কথা ভাবতে ভাবতেই সকালবেলা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ এল। নানা কাজের খবরের পাশে হঠাৎ চোখে পড়ল এক মোক্ষম, মর্মান্তিক সংবাদ— 'এখন থেকে সিগারেট কোম্পানিরা আর খেলাধুলায় স্পন্সর করতে পারবে না'। কাগজ-হাতে, হস্তে-গণ্ড অবস্থায় ভাবছি, দেশটার হলো কী? শেষ পর্যন্ত দেশের পরিচালক যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও আমার মতো নির্বোধের অনুপ্রবেশ! কী ভয়ানক অন্যায়, কী সুগভীর ষড়যন্ত্র!

ঠিক এমন সময় আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীমান বিবেকের সহাস্য আবির্ভাব। আমার এই বন্ধুটি বেশ একটু বেয়াড়া গোছের। সবকিছুতেই তার খুঁতখুতে অভ্যেস, কিছুতেই যেন তার মন ওঠে না। অসন্তোষই তার স্বভাব। এমনতরো স্বভাব এ যুগে অচল। এ যুগ হলো মানিয়ে চলার যুগ, অ্যাড্‌জাস্টমেন্টের যুগ, ম্যানেজ করে চলার যুগ। তা, এই গোঁয়ারগোবিন্দ এসব কিছুতেই মানবে না। আমার সঙ্গেও তার এই নিয়ে মাঝে মধ্যেই দ্বন্দ্ব। কিন্তু এমনি নাছোড়বান্দা সে, যে আমি তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে আমায় ছাড়বে না। আমার সব ব্যাপারে সে নাক গলায়, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো। কতবার তাকে না জানিয়ে হয়তো কোনো ব্যাপার একটু 'ম্যানেজ' করে এনেছি প্রায়, ঠিক সময়ে গোমড়াবদন বিবেকচন্দ্রের আবির্ভাব। ব্যাস, হয়ে গেল সে কাজের গঙ্গাপ্রাপ্তি। এমন অলক্ষুণে সর্বকর্ম পণ্ডকারী যে, কেউ কি তার বন্ধু হতে পারে? কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমায় ছাড়বে না। আসলে আমার জীবনে মহাশত্রু রাহু ও। আমার আশা-ভরসা, ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুর সর্বনাশই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আমার জীবনটা মাটি করে দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তবু তাকে তাড়াতে পারি না। বাড়ি জবরদখল করা ভাড়াটের মতো ঘাড়ে চেপে আছে আমার।

তা এহেন সদা-অপ্রসন্ন, সদা-বিষণ্ণ, বিরসবদন বিবেকের সহাস্য আবির্ভাবে সকলাবেলার চায়ের চুমুকে বিষম লেগে, চা ছল্‌কে পড়ে ধোপদুরস্ত পঞ্জাবির বিপর্যস্ত দশায় এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল আচমকা। জল দিয়ে পঞ্জাবির কলঙ্কমোচনের ব্যর্থ চেষ্টা করে, মুখে-চোখে জলের ঝাপটা মেরে, কলের জলে চোখের জল ধুয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে দেখি, বন্ধু আমার তেমনি দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন। দেখে হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। আবার আদিখ্যেতা কত! নিজেই উদ্যোগী হয়ে অন্দরমহলে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলেন তিনি। বললেন, 'তোর চা-টা তো পড়েই গেল, তাই দু-কাপই আনতে বললাম।' আহা! মরে যাই, দরদ দেখে বাঁচিনে।

যাই হোক, চা এল এবং নির্বিঘ্নে তা গলা দিয়ে নেমেও গেল। আরামকেদারায় গা এলিয়ে বন্ধু সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ করলেন, 'আঃ।' পিত্তি জ্বলে যায়। বললাম, 'কী এমন পুলক জাগলো, যে তোমার মুখের আজন্ম অমাবস্যায় পূর্ণিমার ঝিলিক?' 'গোমুখ্য, কাগজ হাতে বসে আছে, দেখনি, কতবড়ো সুখবর?' —বলেই আঙুল দিয়ে দেখাল সেই সিগারেট কোম্পানির স্পন্‌সরশিপ্ সংক্রান্ত খবরটা।

এবার হাসির পালা আমার। হো হো করে অট্টহাস্যে তাকে চমকে দিয়ে বলি, 'বৎস বিবেকচন্দ্র, মাটিতে নেমে এসো বাবা। তোমার ওই অনভ্যস্ত উৎসাহের বেলুনে চড়ে অত উঁচুতে ভেসো না।'

—'কেন-কেন-কেন?' বিস্ময়ে শ্রীমানের দু'চোখ যেন পাঁচ টাকা সাইজের কালোজাম। বললাম, 'আমাদের দেশটার নাম মনে আছে?'

—'কী ইয়ার্কি হচ্ছে? দেশের নাম মনে থাকবে না?'

—বাপু হে, 'ডি এল রায়ের সেই শাশ্বত কথাটি মনে আছে— 'সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ'? এদেশে সাদা-চোখে যা দেখবে সব ভুল। বলতে পারো রেল কোম্পানি টাইম টেবিল ছাপায় কেন?'

—'কেন আবার? সবাই যাতে জানতে পারে ট্রেনের যাতায়াতের সময়।'

—'আজ্ঞে না কত্তা। ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো। টাইম টেবিলের সময়ে কখনো ট্রেন যাতায়াত করে? আসলে ওই ছাপানো সময়ে তো ট্রেন আসা যাওয়া করেই না। তাই বেশির ভাগ বুদ্ধিমান লোক ওই ছাপানো সময় বাদ দিয়ে স্টেশনে আসে। কারণ এদেশের মানুষ এটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনেই নিয়েছে।'

রেগে আগুন, তেলে-বেগুন হয়ে বিবেক বলল— 'তা তোমার এই ধান ভানতে শিবের গীত কেন? সিগারেটের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা ভালো পদক্ষেপ, তাতেও তোমার যত আবোল তাবোল কথা।'

—আবোল তাবোল নয় রে ভাই। নিজে নির্বোধ হলেও সমাজে তো বাস করি। চারদিকে অজস্র চালাক মানুষের বুদ্ধির এঁটো ধোঁয়া আমার 'নাকের ভিতর দিয়া মরমে', কিঞ্চিৎ হলেও, প্রবেশ করে। তাই তোমার মতো কথায় কথায় তাথৈ নেত্য আমার আসে না। আরে বাপু, যানবাহনে, সিনেমা হলে, হাসপাতালে ভুল বাংলায় নোটিশ টাঙানো— 'ধূমপান নিষেধ।' ভদ্রজনের ভাষায়ও লেখা— 'Smoking Prohibited' —কিন্তু কোথাও কি কেউ ধূমপান বন্ধ করে? এই যে ডাক্তারবাবুরা হার্টের রুগি পেলেই গম্ভীর গলায় হাঁকেন— 'স্মোকিং বন্ধ করুন।' তা, তাঁদের সে কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তারা তো দেখছে ডাক্তারবাবু নিজেই একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সিগারেটের বিরুদ্ধে ফরমান জারি করছেন। লোকে বুঝছে এসব কথার কথা। ওঁদের ওকথা বলার নিয়ম, তাই বলেন। নিজেও মানেন না কেউ মানবে বলে আশাও করেন না। কেউ মানুক, তা চানও না বোধ হয়। আর লোকে যদি সত্যি সত্যি সিগারেট বন্ধ করে ভালো থাকে, তাহলে ডাক্তারবাবুরা কি আর ভালো থাকতে পারবেন? তখন হয়তো রুগীরা সিগারেট না খাওয়ায় ডাক্তারবাবুদের হার্টে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং যা হবার তাই হচ্ছে— এখানে, ওখানে, সেখানে সর্বত্রই 'ধূমপান বন্ধ করুন'-এর দশা নিতান্ত 'করুণ'।'

—'তা হলে তুই বলছিস, এই যে স্পন্‌সরশিপ বন্ধ করার ব্যবস্থা, এতে কিচ্ছু হবে না?'

—'কিস্‌সু হবে না। আরে ওসব হাই-ফাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্ আর মাল্টিন্যাশনালিস্টদের ব্যাপার। ওরা এ দরজা না হলে ও দরজা দিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। ওদের তো প্রচার চাই। সারা দেশে মানুষ-মারা বিষ ছড়িয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে সুগন্ধি সেন্ট না ছড়ালে কি ওদের চলে? তাই খেলার মাঠে কিংবা সুরের হাটে ওদের বদান্যতার কাড়াকাড়ি, ছড়াছড়ি। এসব ভেবে লাভ নেই রে ভাই। এ সমাজ একদিন এমনি করে পচে গলে শেষ হয়ে যাবে।'

বিবেকের মুখে বাক্যি বন্ধ, রা সরে না। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। ওর মুখের সেই আদি অকৃত্রিম হাঁড়িপানা ছিরি আবার ফিরে এল। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমিও নিশ্চিন্ত, অন্তত বেশ কিছুদিন জ্বালাতে আসবে না আমাকে।

(বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

আয়ুষ্মান ভারতে এখন ক্যানসার ও ডায়াবেটিসও

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ দেশের প্রান্তিকতম মানুষরা এখন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন। এবং তা সম্ভব হয়েছে 'আয়ুষ্মান ভারতে'র মতো জনদরদি প্রকল্পের কারণে। দেশের দরিদ্র মানুষরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন। এটি শুধু একটি আয়ুষ্মান কার্ড নয়; এটি দরিদ্র মানুষের জন্য একটি জীবনরেখা।

- এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্প। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীরা, হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা পায়।
- রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের নিজস্ব খরচে ১৫.৫ কোটি পরিবারে সুবিধাভোগীর জন্য কাঠামো বৃদ্ধি করেছে।
- ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৩.৩ কোটি সুবিধাভোগী যাচাই করা হয়েছে এবং আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করা হয়েছে।
- ২৬,৪৩৪ জন পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ৪.৪৯ কোটি রোগী ভর্তির জন্য ৫৪,২৪১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ক্যানসার, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হয়।

'ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসে' ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগকর্তা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ জাতীয় স্তরে কর্মসংস্থান পরিষেবা প্রদানের জন্য, এখন ১০.৪১ লক্ষ নিয়োগকর্তা ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসে নিবন্ধিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের জুলাইয়ে এটি শুরু করেছিল। এখানে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় চাকরির জন্য নিবন্ধন করা যায়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে, এই অনলাইন পোর্টালে সর্বাধিক ৩৫.৬ লক্ষ শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছিল। ২০২১ সালে ১৩ লক্ষ শূন্যপদ ছিল। যে কোনো ব্যক্তি তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির জন্য এখানে অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস (এনসিএস) প্রকল্পটিকে একটি মিশন মোড প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় কর্মসংস্থান পরিষেবার রূপান্তরের জন্য এখানে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান-সম্পর্কিত পরিষেবা যেমন কেরিয়ার কাউন্সেলিং, বৃত্তিমূলক নির্দেশিকা, দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স, ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি রয়েছে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের জুলাইয়ে https://www.ncs.gov.in/Pages/default.aspx— এই অনলাইন পোর্টালটি চালু করেন। চাকরি প্রার্থী, চাকরি প্রদানকারী, সরকারি নিয়োগকর্তা, নিয়োগ প্রতিষ্ঠান এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পোর্টালে লগ ইন করতে পারে।

জনঔষধি প্রকল্পে উপকৃত দেশ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিকল্পনা ওষুধের নাম নিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বেগ দূর করেনি, বরং এটি তাদের জীবনকে আরও সহজ করে তুলেছে। প্রকল্পটি সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সাধারণ মানুষ জনঔষধি কেন্দ্র থেকে উপকৃত হয়েছেন। ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে ২০৩৯ ধরনের ওষুধ এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, দেশবাসী ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করেছে। প্রতিদিন দেশের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ জনঔষধি কেন্দ্র থেকে ওষুধ কেনেন। বাজার মূল্যের তুলনায় এই কেন্দ্রে ওষুধের দাম ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে, ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রগুলি ১১০০ কোটি টাকার বেশি ওষুধ বিক্রি করেছে, যার ফলে নাগরিকদের প্রায় ৬৬০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

- সরকার ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১০ হাজার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ৯৩০৭, ১২ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত।

দেশের ৬০ শতাংশ গৃহস্থালিতে কলের জল সরবরাহ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ জল জীবন মিশন দেশের গ্রামাঞ্চলে ৬০ শতাংশ পরিবারে কলের জল সরবরাহ করেছে। মিশনের অধীনে প্রায় সাড়ে তিন বছরে ৮.৫০ কোটি নতুন কলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ১১.৭৩ কোটি বাড়িতে অর্থাৎ দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ বাড়িতে কলের জল পাওয়া যাচ্ছে। একত্রে, দেশের প্রায় ১.৫৫ লক্ষ গ্রামের বাড়িতে ১০০ শতাংশ কল থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই গ্রামগুলি ‘হর ঘর জল’ গ্রামে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে, প্রতিদিন গড়ে ৮৬,৮৯৪টি কলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট জলজীবন মিশন ঘোষণা করেছিলেন, তখন ১৭ শতাংশেরও কম পরিবারের কাছে শুদ্ধ জলের প্রাপ্যতা ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, ‘বড়ো সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। এর ফলে দেশের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। আমরা ভবিষ্যতে এর পরিধি আরও দ্রুত গতিতে বাড়ানোর জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’ এখন পর্যন্ত ১১.৬৬ কোটি পরিবার এবং ৫৮ কোটি মানুষ কল সংযোগের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছেন।

স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন ‘ফুড স্ট্রিট প্রোজেক্টে’র পর্যালোচনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

পিআইবি॥ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য সারা দেশে ১০০টি স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন ফুড স্ট্রিট তৈরির জন্য ‘ফুড স্ট্রিট প্রোজেক্ট’টি পর্যালোচনা করেছেন। পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবং ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষিত খাদ্যাভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া যাতে খাদ্যজনিত অসুস্থতা কমে এবং সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের ন্যাশনাল হেলথ্ মিশন (এনএইচএ) পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১০০টি ফুড স্ট্রিট’কে ১ কোটি টাকা করে সহায়তা দেবে। এই অনুদান দেওয়া হবে ৬০ : ৪০ বা ৯০ : ১০ অনুপাতে। শর্ত থাকবে যে এফএসএসএআই-এর বিধি-নিয়ম মেনে এই ‘ফুড স্ট্রিট’গুলি ব্র্যান্ডিং করতে হবে।

আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে নিরাপদ পানীয় জল, হাতধোয়া, শৌচাগার ব্যবস্থা, মেঝেতে টাইলস লাগানো, যথাযথ তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডাস্টবিন রাখা, বিলবোর্ড ব্যবহার, মজুত রাখার ব্যবস্থা, আলো, বিশেষ বিশেষ খাবারের জন্য বিশেষ ধরনের ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির জন্য।

ভারতের খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাস্তার খাবার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে সুলভে ও সহজে খাবার খেতে রাস্তার খাবারের দোকানগুলিই ভরসা। তবে, এগুলির সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক ‘ফুড স্ট্রিট’ হাবগুলির খাদ্যের মান এবং পরিচ্ছন্নতার উন্নতি ঘটাতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ অডিট, শংসাপত্র দান ইত্যাদি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চারটি ‘ফুড স্ট্রিট’ গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। এর পাশাপাশি অসমে চারটি, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটি করে ‘ফুড স্ট্রিট’ তৈরি করা হবে।

বাংলাদেশে আরও এক হিন্দু কিশোরী হত্যা, আতঙ্কিত সংখ্যালঘুরা

সংবাদদাতা॥ হিন্দুদের উপর বীভৎস অত্যাচারের কথা আর কত তুলে ধরা যাবে? ভিতরে নীরবে কষ্টগুলি আর পুষে রাখা যায় না। একদম মানবিক কারণেই ক্রমাগত ঘটে যাওয়া অমানবিক ঘটনাগুলি বাদ দিতে পারা যায় না। নির্যাতনের মাত্রা কতটুকু সীমানা অতিক্রম করেছে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে যে খবর এপারের কেউ রাখে না। মুক্তা রানি বর্মন, বয়স মাত্র ষোলো। নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার বাউসী ইউনিয়নের প্রেমনগর ছালিপুরা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। চাঁদের মতোই ফুটফুটে সুন্দর মুক্তা রানি নিখিল বর্মনের মেয়ে। সঙ্গতিহীন পরিবারের এই মেয়েটি উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য। নাচে গানে পারঙ্গম মুক্তা ঠিকই মুক্তার মতো।

যেমন রূপ তেমন গুণ। মা বাবার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠতে লাগলো মুক্তা। এলাকার সম্মানও বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল ঠিকঠাক ভাবেই। বাদ সাধলো একই গ্রামের বখাটে মুসলমান যুবক কাউসার মিয়া। মুক্তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ায় সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মুক্তার পরিবার থেকে বিষয়টি বখাটের পরিবারকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু বলে কথা! একটা হিন্দুকে যদি মুসলমান বানানো যায় তা হলে বেহেস্ত ঠেকাবে কে? হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করলেই বেহেস্ত নিশ্চিত। সমস্ত অপচেষ্টা যখন ব্যর্থ কাউসার তখন মুক্তাকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়। সেই মতো মুক্তার স্কুল ছুটির শেষে অন্যদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে অতর্কিতে আক্রমণ করে। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে কাউসার জঙ্গলে পালিয়ে যায়। মুক্তার অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটল তাকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠালে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই খবর ছড়িয়ে গেলে সারাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে উঠে। মুক্তার নিজস্ব সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী সারা দেশে এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু হত্যা যে দেশে সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে সেখানে প্রতিবাদ অনেকটাই কলাপাতা নড়াচড়ার মতো। ফল কিছুই না। পুলিশ নীরব, প্রশাসন নীরব, জাবরকাটা বুদ্ধিজীবীরা ভিতরে ভিতরে খুশি। নামকাওয়াস্তে মুখ খুললেও কার্যকর হবে এমন কোনো বাক্যব্যয় তেনারা করেন না। সরকারের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। হিন্দু হত্যায় তাদের কিছুই যায় আসে না। বাংলাদেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী আবুল বারাকাত সাহস করে বলেছিলেন, যে হারে হিন্দু কমছে এতে কম সময়ের মধ্যেই দেশটি হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। এই হত্যার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভাতঘুমে আছে। সুশীল সমাজ নীরব। অসাম্প্রদায়িক চেতনাধারার পণ্ডিতেরাও না দেখার ভান করে আছেন। ভারতে মাফিয়ারাজ আতিক খুন হওয়াতে ঢাকায় অনেকে অখুশি হয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা কলম নিয়ে বিরামহীন লেখায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মনে হচ্ছে আতিক হত্যার প্রতিবাদ করা কর্তব্য হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারত ভারতই। ভারত বাংলাদেশের মতো নয়। বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ নিয়ে বলতে গেলে আগে ভারতকে জানতে হবে। ভারত সহিষ্ণু দেশ, শান্তির দেশ, নিরাপত্তার দেশ। কথায় কথায় ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের একটা মজ্জাগত স্বভাব। স্মরণকালের এ বর্বরতা ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন একটা জীবন্ত নরক বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রান্তিক কৃষকদের সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ দেশের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের ক্ষুদ্র কৃষি চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনা করে। এই প্রকল্পটি কেবল দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মহাজনদের কবল থেকে মুক্তই করেনি বরং তাঁদের স্বনির্ভর করতেও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ১০০ শতাংশ কিষাণ সম্মান নিধি কৃষকদের জীবনকে সহজ করেছে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশতম কিস্তি হিসেবে ১৬,৮০০ কোটি টাকা কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল।

ভারতে ৮০ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছেন। সরকারের অগ্রাধিকার স্থল এই কৃষকদের জীবন সুরক্ষিত করা।

এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১.৫ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ৫০ কোটিরও বেশি মহিলা কৃষকদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৪৪ ।।

লুইভিল মধ্য আমেরিকার কেনটাকি রাজ্যের প্রধান শহর। তারই মাইল পঞ্চাশ দূরে গেটসেমানিতে আশ্রমে পরবর্তীকালে লুইবাবা থাকতেন। সে জায়গাটা তপোবনের মতো। আড়াইশো মৌনী সাধু থাকতেন সেখানে। ছিল আশ্রমের মতোই গোরু-বাছুর, খেত-খামার।

আমেরিকায় ৫ বছর ৮ মাস ধর্ম প্রচার করে ভারতে ফিরলে বোম্বাইয়ে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

(ক্রমশ)